POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 34

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 Aug, 2023 6 সফর 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

কুরআন সাত রকম পদ্ধতিতে নাযেল হয়েছে। তুমি এর মধ্য থেকে যেটি সহজ মনে কর পড়তে পার।

২৪১৯) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে: আমি হযরত হিশাম বিন হাকিম বিন হাযাম (রা.) কে সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনি, কিন্তু আমি যেভাবে পাঠ করি তার থেকে ভিন্ন পন্থায়। আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এই সূরাটি পড়িয়েছিলেন। আর আমি তাঁকে প্রায় মারতে উদ্যত হই। কিন্তু আমি তাঁকে নামায পড়ার সময়টুকু পর্যন্ত ছাড় দিই। এরপর আমি তাঁর বুকের চাদর ধরে তাঁকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে টেনে নিয়ে আসি। আমি বলি, (সূরা ফুরকান) যেভাবে আপনি আমাকে পড়িয়েছিলেন তার থেকে পৃথকভাবে (হিশামকে) পড়তে শুনেছি। আঁ হযরত (সা.) বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি (সা.) তাকে বললেন, পড়। তিনি পড়তে শুরু করলেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, এভাবেই নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি (সা.) আমাকে বললেন, তুমি পড়। আমি পড়লাম। তিনি (সা.) বললেন, এভাবেই নাযেল হয়েছে। এরপর (বললেন) কুরআন সাত রকম পদ্ধতিতে নাযেল হয়েছে। তুমি এর মধ্য থেকে যেটি সহজ মনে কর পড়তে পার।

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল খুসুমাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৭ জুন ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

স্মরণ রেখো! যতক্ষণ পর্যন্ত ইহজগতেই স্বর্গীয় জীবনের সূচনা না হয় এবং ইহজগতেই স্বর্গীয় পরিতোষ লাভ না কর, ততক্ষণ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়ো না। কেননা, যে ব্যক্তি ইহজগতে রিক্তহস্ত থাকে অথচ মৃত্যুর পর জান্নাতের আশা করে তার এমন আশা দুরাশাই বটে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

ইবাদতের তাৎপর্য

মানুষের জন্য ইবাদতের অর্থ হল যাবতীয় কুটিলতা ও জটিলতা দূর করে হৃদয়ের ভূমিকে মসৃণ করে তোলা, ঠিক যেমনভাবে কৃষক ভূমিকর্ষণ করে তা মসৃণ করে তোলে। ..... অনুরূপভাবে হৃদয়ের ভূমি যখন কোন নুড়ি ও পাথর মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ সমতল হয়ে ওঠে এবং এতটাই শুদ্ধ হয় যেখানে থাকে শুধুই আত্মা- এরই নাম ইবাদত। এমনভাবে আয়নাকে যদি পরিস্কার করা হয় তবে তাতে মানুষের মুখ দেখা যায়। আর ভূমিকে এমনভাবে কর্ষণ করলে তাতে নানান ধরণের ফল উৎপাদিত হয়। অতএব, মানুষকে যেহেতু ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে,তাই যদি সে নিজের হৃদয়কে মলিনতা থেকে মুক্ত করে এবং তাতে কোন প্রকার ঋজুতা, বন্ধুরতা ও নুড়ি-পাথর না থাকতে দেয়, তবে তার মধ্যে খোদাকে দেখতে পাওয়া যায়।

বেহেশত ও জাহান্নাম

বস্তত স্বর্গীয় জীবনের সূচনা হয় ইহজগতেই। এর বিপরীতে খোদা তা'লা এবং তাঁর রসুল থেকে বিছিন্ন হয়ে যে তমশাচ্ছন্ন জীবন অতিবাহিত হয় সেটিই হল নরকীয় জীবনের নমুনা। আর ইহজগতের এই জান্নাতটিই মৃত্যুর পর জান্নাত হিসেবে লাভ হবে। এই কারণেই জান্নাতবাসীরা জান্নাতের আশীর্বাদ ভোগ করার সময় বলবে- هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

'এটা তো সেটাই যা ইতিপূর্বে আমাদের দেওয়া হয়েছে।'

(আল বাকারা: ২৬) পৃথিবীতে মানুষ যে জান্নাত লাভ করে তা قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا - উপর অনুশীলন করার মাধ্যমে লাভ করে। মানুষ যখন ইবাদতের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম অনুধাবন করে, তখন খোদা তা'লার আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের এক পবিত্র ধারা সূচিত হয়। অতঃপর মৃত্যুর পর যে আশীর্বাদসমূহ বাহ্যিক, দর্শনসাধ্য ও অনুভবনীয়ভাবে লাভ হয় এখন আধ্যাত্মিকভাবে তার স্বাদ আস্বাদন করে। অতএব, স্মরণ রেখো! যতক্ষণ পর্যন্ত ইহজগতেই স্বর্গীয় জীবনের সূচনা না হয় এবং ইহজগতেই স্বর্গীয় পরিতোষ লাভ না কর, ততক্ষণ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়ো না। কেননা, যে ব্যক্তি ইহজগতে কপর্দকশূন্য থাকে অথচ মৃত্যুর পর জান্নাতের আশা করে তার এমন আশা দুরাশাই বটে। এমন ব্যক্তির জন্য এই আয়াতটি যথার্থ- مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

এই কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের আল্লাহ্ ব্যতিরেকে হৃদয় থেকে নুড়িতে পূর্ণ পাথুরে মাটি পরিস্কার করতে সক্ষম হও এবং এটিকে আয়নার মত ঝকঝকে ও সুর্মার ন্যায় শুদ্ধ করে তোল, ততক্ষণ ক্ষান্ত হয়ো ন। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭২)

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মানুষকে সম্মান দান করেছেন, কোন জাতিবিশেষকে নয়। অতএব এক জাতি অপর জাতির সামনে যেন বড়াই না করে।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)সূরা নহলের ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এখানে যে বলা হয়েছে যে, তোমাদের খোদা এক ও অভিন্ন-এটি কেবল দাবিসর্বস্ব নয়।কুরআন করীম যখন অস্বীকাকারীদেরকে সম্বোধন করে, তখন শুধু দাবি উপস্থাপন করে না, কেননা শুধু দাবি তাদের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং এমন ক্ষেত্রে সে দুটির মধ্যে একটি পন্থা অবলম্বন করে। হয় দাবি করার পর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করে, অথবা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পর এই উপসংহার করে। এই দুই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের মন আশ্বস্ত হয়। এবং কার্যত এই উভয় পন্থাই অত্যন্ত উপযোগী। অনেক সময় দাবি করার পর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা কার্যকরী হয় আর অনেক সময় ঘটনা বর্ণনা করার পর যুক্তি দেওয়া বেশি উপযোগী হয়। এখানে দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা হয়েছে এবং প্রথম আয়াতের যৌক্তিক উপসংহার পেশ করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একসূত্রে গ্রোথিত রয়েছে এবং একটি বস্তু অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল। মানুষের সৃষ্টি হল মূল বিষয়। তার প্রথম খাদ্য হল প্রাণীজ। প্রাণী গাছপালা ভক্ষণ করে। প্রাণীজগত গাছপালা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আর গাছপালা তথা উদ্ভিদজগত বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্টি লাভ করে আর সেই জল মানুষেরও পানের কাজে আসে। সেই জল থেকে শস্যদানা উৎপন্ন হয় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সবই দিবারাত্রি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। অপরদিকে এগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যম হল সমুদ্র যার জলরাশি থেকে মানুষ জল লাভ করে আর সমুদ্রকে পুষ্ট রাখতে পাহাড় রয়েছে যেখানে জল সঞ্চিত থাকে। সেখান থেকে নদ-নদীর মাধ্যমে জলের প্রবাহ বিশেষ বিশেষ পথে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়, নদীর ধারাগুলি ভূ-পৃষ্ঠে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে না যাতে তা মানুষের বসবাসের যোগ্য না থাকে। এই বিষয়গুলি থেকে একটি স্পষ্ট

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে অধমের ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের মোলাকাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র বিয়ের সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন রেওয়ায়েত সম্পর্কে প্রণিধান ও অভিনিবেশ করার এবং এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনা করার পর এ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন,

উত্তর: মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র বিয়ের সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স সম্পর্কে, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ, তফসীর এবং হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক মতভেদ পাওয়া যায়। অতএব, মহানবী (সা.)-এর সাথে নিকাহ্র সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স ৭ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত এবং রুখসতী (বা কনে বিদায়ের) সময় ৯ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত (বয়স) লেখা হয়েছে।

যদিও সিহাহ্ সিত্তার বিভিন্ন রেওয়ায়েত যাতে বুখারীর হাদীসও রয়েছে, তাতে হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স নিকাহ্র সময় ছিল ৬ বছর এবং বিয়ের সময় ৯বছর বর্ণিত হয়েছে। তবে, এসব হাদীসকে যদি বর্ণিত বিষয়বস্তু ও বর্ণনার রীতির আলোকে যাচাই করা হয় তাহলে হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স সম্পর্কে বর্ণিত এসব হাদীস নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডের নিরিখে নিম্নতর সাব্যস্ত হয়।

এ সম্পর্কে সিহাহ্ সিত্তায় বর্ণিত ২১টি হাদীস থেকে ১৪টি হাদীস হিশাম বিন উরওয়াহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং বাকী রেওয়ায়েতগুলো আবু উবায়দাহ্, আবু সালমাহ্ এবং আসওয়াদ কর্তৃক বর্ণিত। সবচেয়ে মজার বিষয় হল, ইতিহাস এবং জীবনচরিতের এই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি কোনো বিখ্যাত সাহাবী বর্ণনা করেন নি।

হযরত আয়েশা (রা.)'র অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েত প্রথমবার ১৮৫ হিজরীতে প্রকাশ্যে আসে অথচ তখন এই বিষয়ের অধিকাংশ হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারী হিশাম এবং উরওয়াহ্র মৃত্যুবরণের দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছিল। অধিকন্তু, হিশাম এবং উরওয়াহ্- যাদের জীবনের অধিকাংশ সময় মদীনায় কেটেছে আর মদীনার স্বনামধন্য মুহাদ্দীস ইমাম মালেক (রহ.) তার (অর্থাৎ হিশাম বিন উরওয়াহ্)'র একজন গর্বিত শিষ্য ছিলেন। এদতসত্ত্বেও নিজের রচিত গ্রন্থ মুয়াত্তা ইমাম মালেক-এ এই রেওয়ায়েতের কোনো উল্লেখ নেই। হিশাম বিন উরওয়াহ্ তার জীবনের শেষকালে দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। (জারাহ্ ও তা'দীল তথা হাদীস গবেষক ও বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে) তাকে বিভ্রান্তি এবং ভুলে যাওয়ার রোগে পেয়ে বসেছিল। সে সময় তিনি যখন কূফায় চলে গিয়েছিলেন তখন তিনি প্রথমবার এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন আর যার কাছে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছিলেন তিনিও তার মৃত্যুর পর প্রায় আরো চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেন এবং এরপর এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেন যাতে কোনোরূপ প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নই না উঠতে পারে।

অতএব, মদীনায় অবস্থানকালে হিশামের এই রেওয়ায়েত বর্ণনা না করা এবং তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পর প্রণীত গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করা মূলত এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে। এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, নবী-পরিবার এবং বিশেষভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)'র ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই হাদীস রচনা করা হয়েছে। যাতে প্রমাণ করা যায় যে, সেই পবিত্র সহধর্মিণী যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ ছিল যে, তাঁর কাছ থেকে ধর্ম শেখো। মহানবী (সা.) তাঁকে (তাঁর) অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন যখনও তিনি তাঁর সখিদের সাথে পুতুল দিয়ে খেলতেন। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের সময়ও তিনি শৈশবকালেই ছিলেন, তাই তাঁর কাছ থেকে কী আর ধর্ম শেখা যেতে পারে?

এরপর সহীহ্ বুখারী যাতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে, স্বয়ং এর মধ্যেই হযরত আয়েশা (রা.)'র নিকাহ্ সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মতবিরোধ পাওয়া যায়। অতএব, একটি রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.)'র বর্ণনা হল, মহানবী (সা.)-এর মদীনায় যাবার তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তেকাল করেন। এরপর মহানবী (সা.) ২ বছর বা এর কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করেন তারপর হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করেন।

কাজেই, হাদীস সংকলকগণ যদিও অনেক সাবধানতার সাথে এই দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন কিন্তু তবুও এর মধ্যে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ আছে, কেননা এই কাজ মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের প্রায় দেড়-দুশ' বছর পর আরম্ভ হয়, যখন মুসলমানরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আরবিভিন্ন মতভেদ তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই, এ যুগের হাকাম ও আদল (ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী) প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ (আ.) অন্যান্য বিষয়ের সংশোধনের পাশাপাশি এ বিষয়টিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন। হুযূর (আ.) বলেন,

"যদিও আমরা সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসগুলোকে যাচাই করছি কিন্তু যে হাদীস পবিত্র কুরআন বিরোধী (এবং) মহানবী (সা.)-এর পবিত্রতা পরিপন্থী তা আমরা কীভাবে মানতে পারি? সেই যুগে হাদীস সংকলন করার সময় ছিল। যদিও তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা বা প্রণিধানের পর হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তদুপরি পুরো সাবধানতা অবলম্বন করতে পারেন নি। সেটি সংকলনের সময় ছিল আর এখন প্রণিধানের সময়।"

(মালফুযাত, নবম খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৪৭২, ১৯৮৪ সালের সংস্করণ)

হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়সের বিষয়টি যখন আমরা অন্য আরেক

আঙ্গিকে যাচাই করি তখন ইতিহাস ও জীবনচরিতের গ্রন্থাবলী থেকে আমরা এটিও জানতে পারি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র চার সন্তানই (হযরত আব্দুল্লাহ্, হযরত আসমা, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত আয়েশা) মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর জীবনীকারদের সংকলিত প্রাথমিক মুসলমানদের তালিকায় হযরত আয়েশা (রা.)'র নামও অন্তর্ভুক্ত আছে। নবুয়তের পঞ্চম বছরে যদি হযরত আয়েশা (রা.)'র জন্ম হয়ে থাকে তাহলে তাঁর নাম প্রাথমিক মুসলমানদের তালিকায় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হল?

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত আয়েশা (রা.)'র দশ বছরের বড় ছিলেন হযরত আসমা আর হিজরতের সময় হযরত আসমার বয়স ছিল ২৭ বছর। এ হিসাবেও হযরত আয়েশা (রা.)'র জন্মসাল নবুয়তের ৪ বছর পূর্বে হয়। আর হিজরতের তিন বছর পূর্বে যদি তাঁর নিকাহ্ হয়ে থাকে তাহলে তখন তাঁর বয়স ছিল ১৪ বছর।

দ্বিতীয় হিজরীতে হয়েছিল উহুদের যুদ্ধ। এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আয়েশা বিনতে আবী বকর (রা.) এবং উম্মে সুলায়েম (রা.) নিজেদের পিঠে বহন করে পানির মশক নিয়ে আসতেন এবং লোকদেরকে পানি পান করাতেন। হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স যদি এত অল্পই হবে তাহলে তিনি মশক ভর্তি পানি নিজের পিঠে বহন করে কীভাবে ছুটে ছুটে যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন করতে পারেন? অতএব এর মাধ্যমেও প্রমাণ হয় যে, দ্বিতীয় হিজরীতে তাঁর বয়স অবশ্যই এতটা ছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এধরনের ভারী কাজ করতে পারতেন।

ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে বিয়ের পূর্বে জুবায়ের বিন মুতঈম এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র বাগদান হয়েছিল। সে সময় তাঁর বাগদান হওয়ার ঘটনা বলছে যে, তাঁর বয়স ছয় বছর ছিল না। বিশেষভাবে এটি এজন্যও যে, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)'র জন্য বিয়ের প্রস্তাব পান তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) জুবায়ের বিন মুতঈমের কাছে হযরত আয়েশা (রা.)'র রুখসতি বা তাঁকে বিয়ে করার বিষয়ে জানতে চান। ঐ পক্ষ থেকে নেতিবাচক উত্তরের কারণে সেই সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায় আর এরপর হুযূর (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র নিকাহ্ হয়। জুবায়ের বিন মুতঈমকে রুখসতির জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র বলা প্রমাণ করে যে, হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স তখন অবশ্যই ছয় বছর ছিল না বরং তখনও তিনি বিয়ের বয়সে উপনীত ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পর যে ফলাফল নির্ণয় করেছেন সে অনুযায়ী তিনি (রা.) বিয়ের সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স ১৩-১৪ বছর আখ্যায়িত করেছেন আর এটিই সঠিক বয়স। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স ২১ বা ২২ বছর ছিল, যা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের পরিপূর্ণ এবং পরবর্তীতে লোকদেরকে সেই শিক্ষা প্রদানের জন্য সর্বোত্তম বয়স ছিল।

এ যুগের হাকাম ও আদল (ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী) সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র বিয়ের সময় তাঁর নয় বছর বয়স সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে একেবারেই বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অতএব, একজন ইসলাম বিদ্বেষী পাদ্রী ফাতেহ্ মসীহ্র বিভিন্ন আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হুযূর (আ.) বলেন,

"আপনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)'র উল্লেখ করে নয় বছর বয়সে তাঁর প্রথাগত যে বিয়ের উল্লেখ করেছেন, প্রথমতঃ নয় বছর বয়স থেকে সাব্যস্ত নয় আর এ সম্পর্কে কোনো ওহীও হয় নি এবং পরম্পরাগত সংবাদাদি থেকেও সাব্যস্ত হয় নি যে, অবশ্যই নয় বছর বয়সই ছিল। শুধুমাত্র একজন বর্ণনাকারীর বক্তব্য রয়েছে।"

(নূরুল কুরআন, দ্বিতীয় নম্বর, রূহানী খাযায়েন, নবম খণ্ড, পৃ: ৩৭৭)

একইভাবে অন্যত্র হুযূর (আ.) বলেন, "হযরত আয়েশা (রা.)'র ৯ বছর বয়স্কা হওয়ার কথাটি কেবলমাত্র মাথামুণ্ডহীন (কারও) বক্তব্যে এসেছে। কোনো হাদীস কিংবা কুরআন থেকে

প্রমাণিত।" (আরিয়া ধরম, রূহানী খাযায়েন, দশম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

কাজেই, আলোচনার সারমর্ম হল, এমন সব রেওয়ায়েত যাতে বিয়ের সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র বয়স ৯ বছর বর্ণিত হয়েছে তা অবাস্তব। এসব রেওয়ায়েতে হয়ত রাবীদের ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে নতুবা পরবর্তীতে যেসব রাবী বা বর্ণনাকারী এসেছেন তারা নিজেদের পক্ষ থেকে এতে সংযোজন করে দিয়েছেন। ইতিহাস ও জীবনচরিতের গ্রন্থাবলীতে অভিনিবেশে অকাট্যভাবে

জুমআর খুতবা

হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করেছ অথচ অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে। এই শব্দাবলীর মাধ্যমে কমপক্ষে এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) স্বস্থানে এই বিশ্বাসই রাখতেন যে, এসব যুদ্ধের সূচনা কাফিরদের পক্ষ থেকেই হয়েছে আর তিনি (সা.) অপারগ হয়ে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন।

বদরের যুদ্ধের সেই বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। মুক্তিপণের পরিমাণ ছিল চার হাজার থেকে এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত। তথাপি যারা মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখতো না তাদের জন্য শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যদি মদীনার শিশু-কিশোরদের পড়ালেখা শিখিয়ে দেয় তাহলে তারা মুক্ত হয়ে যাবে। একইভাবে কতিপয় বন্দিকে সামান্য পরিমাণ মুক্তিপণ বা মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন কুরাইশ নেতাদের মধ্য হতে ২৪জন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করলে তাদেরকে বদরের কূপগুলোর মধ্য হতে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়। আর তিনি (সা.) যখন কোনো জাতির বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতেন তখন তিনি (সেই) ময়দানে তিন রাত অবস্থান করতেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৪ জুলাই , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (১৪ ওফা ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,বদরের যুদ্ধের বরাতে মহানবী (সা.)-এর জীবনী এবং বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। বদরের যুদ্ধ সমাপ্ত হয় এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রাপ্য মন্দ পরিণামের সম্মুখীন করেন, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে। (এ যুদ্ধে) ৭০জন কাফির মারা যায় যাদের মধ্যে অনেক নেতা এবং সর্দারও ছিল। এসব কুরাইশ নেতার দাফন সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে এভাবে রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কা'বার পাশে নামায পড়ছিলেন। [পেছনের সকল ঘটনা বা অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে] কুরাইশের কয়েকজন ব্যক্তির প্র রোচনায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা ব্যক্তি সিজদারত অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর কাঁধের মাঝখানে পশুর নাড়িভুড়ি রেখে দেয়। মহানবী (সা.) সিজদাতেই পড়ে থাকেন আর তারা (শত্রুরা) হাসতে থাকে। (তখন) হযরত ফাতেমা আলাইহাস সালামকে কেউ এ বিষয়টি অবগত করে। তখন তিনি অল্প বয়স্কা এক বালিকা ছিলেন, তিনি ছুটে আসেন আর (তখনও) মহানবী (সা.) সিজদায় পড়ে ছিলেন এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর ওপর থেকে সেটি সরিয়ে দেন। হযরত ফাতেমা (রা.) তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। মহানবী (সা.) নামায পড়া শেষ করার পর দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও করো। হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও করো। হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও করো। এরপর তিনি (সা.) নাম উল্লেখ করে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! আমর বিন হিশাম, উতবা বিন রবীয়্যা, শেয়বা বিন রবীয়্যা, ওয়ালীদ বিন উতবা, উমাইয়্যা বিন খালাফ, উকবা বিন আবী মুয়ায়েত এবং উম্মারা বিন ওয়ালীদকে পাকড়াও করো। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! বদরের দিন আমি স্বয়ং তাদেরকে (রণক্ষেত্রে) পড়ে থাকতে দেখেছি যাদের নাম মহানবী (সা.) উল্লেখ করেছিলেন। এরপর তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বদরের বিভিন্ন গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর মহানবী (সা.) বলেন, গর্তবাসীরা! অভিসম্পাতের আওতায় রয়েছে।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুসসালাত, রেওয়ায়েত নম্বর-৫২০)

অনুরূপভাবে জীবনী গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, মহানবী (সা.) মুশরিকদের মরদেহগুলো তাদের নিহত হওয়ার স্থান থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই তাদের নিহত হওয়ার স্থান সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন। যেমন হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে (পূর্বে ই) বদরের (যুদ্ধে) নিহত মুশরিকদের মারা যাওয়ার স্থান দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) এসব নিহত হবার স্থান দেখিয়ে বলছিলেন, ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল উতবা বিন রবীয়্যা এখানে নিহত হবে; শেয়বা বিন রবীয়্যা এখানে নিহত হবে; উমাইয়্যা বিন খালাফ এখানে নিহত হবে; এটি হবে আবু জাহল বিন হিশামের নিহত হবার জায়গা আর এটি হবে অমুকের নিহত হবার স্থান। তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র হাত মাটিতে রেখে এ স্থানগুলো চিহ্নিত করছিলেন। পরবর্তী দিন বদরের যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিল তাদের মরদেহগুলো যেখানে তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র হাত রেখেছিলেন সেসব স্থান থেকে বিন্দুমাত্রও এদিক সেদিক হয়নি। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪৫)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণ না করেছেন, যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করেন যে, নিহত সব কাফিরকে গর্তে ফেলে দাও। অতএব উমাইয়্যা বিন খালাফ ব্যতিরেকে সবাইকে (গর্তে) ফেলা হয়। তার লাশ বর্মের ভেতর ফুলে গিয়েছিল। তাকে উঠাতে গেলে তার (মরদেহ থেকে) মাংস খসে পড়তে থাকে একারণে তাকে সেখানেই মাটি ও পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া হয়।

(সীরাত ইবনেহিশাম, পৃ: ৪৩৫)

মহানবী (সা.) যখন মুশরিকদের মরদেহগুলোকে গর্তে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন, তখন উতবা বিন রবীয়্যার মরদহকে তুলে গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। মহানবী (সা.) উতবার পুত্র হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)'র চেহারায় অপছন্দের ছাপ দেখতে পান। {তিনি (আবু হুযায়ফা) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তার পিতা ছিল কাফির} তিনি (সা.) বলেন, হে আবু হুযায়ফা! মনে হয় তোমার মনে তোমার পিতা সম্বন্ধে কোনো ভাবনার উদয়হয়েছে। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না। আমার পিতা সম্পর্কে ও সন্দেহ নেই আর তার নিহত হওয়া সম্পর্কেও (আমার) সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি জানতাম আমার পিতা অনেক বিচক্ষণ এবং নম্র ও সম্মানিত মানুষ ছিলেন। আমার প্রত্যাশা ছিল, এই বিষয়গুলো (অর্থাৎ তার মাঝে যে ভালো গুণগুলো ছিল তা) তাকে ইসলামের দিকে টেনে আনবে। (কিন্তু) আমি যখন তার পরিণাম দেখলাম তখন আমার তার কুফরীর কথা মনে পড়লো, অথচ আমার একান্ত আশা ছিল যে, সে ইসলাম গ্রহণ করবে। এ বিষয়টি আমাকে দুঃখভারাক্রান্ত করেছে। মহানবী (সা.) আবু হুযাইফার জন্য কল্যাণ কামনা করে দোয়া করেন এবং তার মঙ্গল কামনা করেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৬-৫৭)

হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন কুরাইশ নেতাদের মধ্য হতে ২৪জন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করলে তাদেরকে বদরের কূপগুলোর মধ্য হতে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়। আর তিনি (সা.) যখন কোনো জাতির বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতেন তখন তিনি (সেই) ময়দানে তিন রাত অবস্থান করতেন। তিনি (সা.) যখন বদরের (প্রান্ত রে) অবস্থান করেন আর তৃতীয় দিন আসে তখন তিনি (সা.) তাঁর উটনীর ওপর হওদা বাঁধার নির্দেশ দেন, এরপর তার ওপর হওদা বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর তিনি (সা.) যাত্রা করেন আর তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সাথে যাত্রা করেন আর বলেন, আমাদের

ধারণা হয় যে, তিনি কোনো উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছেন। তিনি (সা.) সেই কূপের কিনারায় পৌঁছে দাঁড়ান যেখানে কাফিরদেরকে কবরস্থ করার জন্য নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি (সা.) সেসব নিহতের নাম ও তাদের পিতাদের নাম নিয়ে ডাকতে থাকেন যে, হে অমুকের পুত্র অমুক,! হে তমুকের পুত্র তমুক! তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে তাহলে এখন কি তোমরা আনন্দিত হতে না? কেননা আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য প্রমাণিত হতে দেখছি, তোমরাও কি সত্যিকারঅর্থেই তা পেয়েছ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের প্রভু তোমাদের দিয়েছিলেন?

আবু তালহা (রা.) বলতেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এসব মরদেহের সাথে কি কথা বলছেন? এদের মাঝে তো প্রাণ নেই, এরা মৃত মানুষ। মহানবী (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ রয়েছে! আমি যা বলছি তা তুমি তাদের চেয়ে বেশি শুনছ না। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৭৬)

সীরাত ইবনে হিশাম-এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হে কূপবাসীরা! তোমরা তোমাদের নবীর অতি নিকৃষ্ট স্বজন ছিলে, তোমরা আমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছ অথচ অন্যরা আমার সত্যয়ন করেছে। তোমরা আমাকে স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত করেছ অথচ অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করেছ অথচ অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে। এরপর বলেন, هَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ (উচ্চারণ: হাল ওয়াজাদতুম মা ওয়াদাকুম রাব্বুকুম হাক্বা') অর্থাৎ তোমাদের প্রভু তোমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? (সীরাত ইবনেহিশাম, পৃ: ৪৩৫)

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে লিখেছেন, (বদরের প্রান্তর থেকে) ফিরে আসার পূর্বে মহানবী (সা.) সেই গর্তের কাছে যান যেখানে কুরাইশ নেতাদের কবরস্থ করা হয়েছিল এবং এরপর তাদের একেক জনের নাম নিয়ে ডাকেন এবং বলেন, هَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ حَقًّا فَإِنِّيْ وَجَدْتُّ مَا وَعَدَنِيَ اللهُ حَقًّا অর্থাৎ তোমরা কি সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রমাণিত হতে দেখেছ যা খোদা তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদের সাথে করেছিলেন? আমি নিশ্চিতভাবে সেই প্র তিশ্র ুতি সত্য পেয়েছি যা খোদা তা'লা আমার সাথে করেছিলেন। আরো বলেন,

يَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ بِئْسَ عَشِيْرَةِ النَّبِيِّ كُنْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ
وَصَدَّقَنِيَ النَّاسُ وَأَخْرَجْتُمُوْنِيْ وَآوَانِيَ النَّاسُ وَقَاتَلْتُمُوْنِيْ وَنَصَرَنِيَ النَّاسُ

(উচ্চারণ: আহালাল কালীবে বেয়সা আশিরাতিন নবীয়্যে কুনতুম লি নবীয়্যেকুম কাযাবতুমুনী ওয়া সাদাকানীন্ নাসি ওয়া আখরাজতুমুনী ওয়া আওয়ানিন্ নাসি ওয়া কাতালতুমুনী ওয়া নাসারিয়ান্ নাসি) অর্থাৎ 'হে গর্তে পড়ে থাকা ব্যক্তিরা! তোমরা তোমাদের নবীর অতি নিকৃষ্ট স্বজন সাব্যস্ত হয়েছ। তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদি বলে প্রত্যাখ্যান করেছ অথচ অন্যরা আমার সত্যয়ন করেছে। তোমরা আমাকে আমার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছ কিন্তু অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ আর অন্যরা আমায় সাহায্য করেছে। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা এখন মৃত, তাদের জন্য শোনা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? তিনি (সা.) বলেন, আমার এই কথা তারা তোমাদের চেয়ে ভালো শুনতে পাচ্ছে।

অর্থাৎ তারা এখন সেই জগতে পৌঁছে গেছে যেখানে সকল সত্য বাস্তব রূপে প্রকাশ পায়, কোনো পর্দা (আর) বাকি থাকে না। মহানবী (সা.)-এর এই বাক্যাবলী, যেগুলো এখনই বর্ণিত হয়েছে, নিজের মাঝে এক অদ্ভুত ব্যথা ও বেদনার মিশ্রন রাখে আর এগুলোর মাধ্যমে হৃদয়ের সেই অবস্থার কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব যা সেই সময় মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে বিরাজমান ছিল। এমন মনে হয় যে, তখন কুরাইশের বিরোধিতার অতীত ইতিহাস তাঁর চোখের সামনে ছিল আর তিনি কল্পনার জগতে এর এক একটি পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর হৃদয় সেসব পৃষ্ঠা পাঠে বিচলিত ছিল। তাঁর (সা.) এই শব্দাবলী এই কথারও নিশ্চিত প্রমাণ যে, একের পর এক সংঘটিত যুদ্ধ আরম্ভ করার দায় সম্পূর্ণরূপে মক্কার কাফিরদের ওপর ছিল। যেমনটি তাঁর শব্দাবলী قَاتَلْتُمُوْنِيْ وَنَصَرَنِيَ النَّاسُ ('কাতালতুমূনী ওয়া নাসারানিয়ান নাসি') থেকে প্রকাশিত। অর্থাৎ হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করেছ অথচ অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে। এই শব্দাবলীর মাধ্যমে কমপক্ষে এতটুকু অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) স্বস্থানে এই বিশ্বাসই রাখতেন যে, এসব যুদ্ধের সূচনা কাফিরদের পক্ষ থেকেই হয়েছে আর তিনি (সা.) অপারগ হয়ে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬৪-৩৬৫)

এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলীরও উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ঘটনা সীরাত গ্রন্থে এভাবে বিদ্যমান যে, ইবনে ইসহাক বলেন, উকাশা বিন মিহসান (রা.) বদরের দিন নিজের তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করতে থাকেন। এমনকি তা তার হাতে ভেঙে যায়। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তখন তিনি (সা.) তাকে একটি লাকড়ি দান করে বলেন, হে উকাশা! তুমি এটি দিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। উকাশা সেটিকে হাতে নিয়ে দোলা দিতেই লাকড়িটি তার হাতে তরবারি হয়ে যায়, যা বেশ দীর্ঘ ছিল এবং যার লোহা অনেক কঠিন ছিল আর তার রঙ ছিল শুভ্র। তিনি সেটি দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেই তরবারির নাম ছিল 'অওন'। পরবর্তী যুদ্ধসমূহেও তিনি উক্ত তরবারি দ্বারা বীরত্বের পরিচয় দিতে থাকেন, যতক্ষণ না মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। (সীরাত ইবনেহিশাম, পৃ: ৪৩৪)

এরপর নিদর্শন স্বরূপ মুখের লালা আর পবিত্র হাতের প্রভাবের উল্লেখও পাওয়া যায়। হযরত কাতাদা (রা.) কর্তৃ ক বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন তার চোখে আঘাত লাগে। তার চোখ তার গালে গড়িয়ে পড়ে, অর্থাৎ অক্ষিগোলক বের হয়ে বাইরে চলে আসে। তিনি সেটিকে নীচে ফেলে দেয়ার ইচ্ছা করেন। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন, না, এমনটি কোরো না। তিনি (সা.) হযরত কাতাদাকে নিজের কাছে ডাকেন আর নিজের হাতের তালুতে তার চোখটি রাখেন। এরপর সেটিকে তিনি তার স্বস্থানে রেখে দেন। অর্থাৎ অক্ষিগোলকটি পুনরায় অক্ষিকোটরে রেখে দেন। তিনি বলেন, এরপর তার মনেই ছিল না যে, তার কোন্ চোখে আঘাত লেগেছিল। চোখটি এরপর এমনভাবে ঠিক হয়ে যায় যে, তার এই অনুভূতিই ছিল না য, এটিই সেই চোখ যা বের হয়ে এসেছিল। বরং এই চোখ অন্য চোখ থেকে সুন্দর দেখাতো। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩)

কোনো কোনো পুস্তকে চোখসেরে ওঠার এই ঘটনাটি উহুদের যুদ্ধের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারো কারো মতে এটি খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের ঘটনা। যাহোক, এটি একটি নিদর্শন ছিল যা বদরের প্রেক্ষিতেও বর্ণিত হয়েছে।

মক্কায় কাফিরদের পরাজয়ের সংবাদ যেভাবে পৌঁছে তার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মুশরিকরা বদরের ময়দান থেকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পালাতে গিয়ে বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত অবস্থায় মক্কার পথ ধরে। লজ্জা ও অনুশোচনায় আতিশয্যে তাদের জন্য এটি বোধগম্য ছিল না যে, তারা কোন্ মুখে মক্কায় প্রবেশ করবে।

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মক্কায় কুরাইশের পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে প্রবেশ করে সে ছিল হায়সুমান বিন ইয়াস বিন আব্দুল্লাহ্। সে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তার কাছে যুদ্ধের খবরাখবর জানতে চায়? সে বলে, উতবা বিন রবীয়্যা, শেয়বা বিন রবীয়্যা, আবুল হাকাম বিন হিশাম অর্থাৎ আবু জাহল, আর উমাইয়্যা বিন খালাফ এবং আরও কতিপয় নেতার নাম নিয়ে বলে যে, তারা নিহত হয়েছে। সে যখন নিহতদের মাঝে কুরাইশ সরদারদের নাম গুণতে আরম্ভ করে তখন মানুষ তার কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা, যে কিনা হাতীম-এ বসা ছিল, সে একথা শুনে বলে যে, কিছুই বুঝতে পারছি না, এই ব্যক্তি হয়ত পাগল হয়ে গেছে। পরীক্ষামূলকভাবে তাকে জিজ্ঞেস করা যাক যে, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা কোথায়? অর্থাৎ, নিজের সম্পর্কেই সে জিজ্ঞেস করে। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার কী হয়েছে? সে ই ব্যক্তিবলে যে, ঐ দেখো সে তো হাতীম-এ বসে আছে। (সে বলে) আমি উন্মাদ হইনি, আমি সবকিছুই দেখতে পাচ্ছি। খোদার কসম! তার পিতা ও ভাইকে আমি স্বচক্ষে নিহত হতে দেখেছি। অর্থাৎ, এতে তার বিশ্বাস হয় যে, এই ব্যক্তি সত্য সংবাদ প্রদান করছে। মোটকথা এভাবে মক্কাবাসীরা বদরের প্রান্তরে স্পষ্ট পরাজয়ের সংবাদ পায় আর তাদের মনমস্তিষ্কে এর এতটা মন্দ প্রভাব পড়ে যে, নিহতদের জন্য বিলাপ করতে তারা নিষেধ করে দিয়েছিল, যেন মুসলমানরা তাদের দুঃখে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ না পায়।

(আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৩০৭-৩০৮)(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০২)

মক্কার কুরাইশের কিছু লোক তাদের নিহতদের জন্য বিলাপ করলে তারা বলে যে, এমনটি কোরো না, অর্থাৎ অন্যরা তাদেরকে এই কথা বলে, কেননা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তারা তোমাদের এই অবস্থায় আনন্দিত হবে। আর নিজের বন্দিদের মুক্তির জন্য কাউকে প্রেরণ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের সম্পর্কে খুব ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে নাও। অর্থাৎ, বিলাপ করা যাবে না আর নিজেদের বন্দিদের মুক্তির জন্য কোনো চেষ্টাও করা যাবে না, যেন মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ফিদিয়া বা মুক্তিপণের বিষয়ে তোমাদের সাথে কোনোরূপ কঠোরতা না করতে পারে। (সীরাত ইবনেহিশাম, পৃ: ৪৪১)

মদীনাবাসীরা বিজয়ের সুসংবাদ কীভাবে পেয়েছে আর তাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল- এ সম্পর্কেও লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কেমদীনার উঁচু এলাকায় এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে মদীনার নিম্নাঞ্চলের দিকেসেই কথার সুসংবাদ প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন যা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূল (সা.)-কে দান করেছিলেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮)

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা উক্ত সংবাদ তখন লাভ করি যখন আমরা হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র স্ত্রী হযরত

রুকাইয়্যা বিনতে রসূল (সা.)-এর কবরের মাটি সমান করে দিয়েছিলাম। তিনি (তাদের) অনুপস্থিতিতে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) আমাকেও হযরত উসমান (রা.)'র সাথে হযরত রুকাইয়্যার শুশ্রূষার জন্য পেছনে রেখে গিয়েছিলেন। আমি আমার পিতা হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র কাছে তখন যাই যখন মানুষ তাকে ঘিরে রেখেছিল। তিনি বলছিলেন যে, উতবা বিন রবীয়্যা, শেয়বা বিন রবীয়্যা, আবু জাহল বিন হিশাম, যামআ বিন আসওয়াদ, আবুল বাখতারি, আস বিন হিশাম, উমাইয়্যা বিন খালাফ, আর হাজাজ-এর দুই পুত্র নুবায়ে ও মুনাব্বেকে হত্যা করা হয়েছে।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩৮)

অপর দিকে মদীনায় এই অবস্থা ছিল যে, মুনাফিক ও ইহুদীরা সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে রেখেছিল যে, মুসলমানরা চরমভাবে পরাজিত হয়েছে আর নাঊযুবিল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.)ও নিহত হয়েছেন। এসব অপপ্রচারে সৃষ্ট ঘোলাটে অবস্থার মাঝে হযরত যায়েদ(রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর উটনীতে আরোহিত অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করেন তখন ইহুদী ও মুনাফিকরা আরও বড় গলায় একথা বলতে আরম্ভ করে যে, দেখেছ! মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন আর (তাঁর) উটনীতে বসে যায়েদ আসছে। হযরত যায়েদ (রা.) যখন এই কথা বলতে আরম্ভ করেন যে, উতবাও নিহত হয়েছে, শেয়বাও নিহত হয়েছে, আবু জাহলও নিহত হয়েছে, উমাইয়্যাও নিহত হয়েছে, তখন মুনাফিকরা বলতে আরম্ভ করে যে, এটি কীভাবে সম্ভব! মনে হয় মুসলমানদের পরাজয় এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর কারণে যায়েদ (রা.) দিগ্বিদিক হারিয়ে বসেছে তাই সে এধরনের কথা বলছে। মক্কার কাফিরদের যে প্রতিক্রিয়া ছিল, মদীনার মুনাফিক এবং ইহুদীদেরও ছিল ঐ একই অবস্থা। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বলেন, আমি যেহেতু মদীনাবাসীর সব কথা শুনছিলাম তাই আমি আমার পিতা যায়েদ (রা.)-কে একপাশে ডেকে নিয়ে যাই আর জিজ্ঞেস করি, হে আমার পিতা! আপনি যা বলছেন তা কি আসলেই সত্য? তিনি বলেন, হে আমার পুত্র! আল্লাহ্‌র শপথ! এমনটিই হয়েছে, আর আমি যা বলছি তা একেবারেই সত্য। মদীনাবাসী এই খবর শুনতেইবিজয়ী নবীর কাফেলাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মুসলমানরা এই বিজয়ে উল্লোসিত ও উৎফুল্ল ছিল। মহানবী (সা.)-এর প্রত্যাবর্তনের জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। এই যুদ্ধে সকল মুসলমান শামিল হয় নি, কেননা মদীনা থেকে যাত্রাকালে তাদের মনে যুদ্ধ হবে- এই মর্মে কোনো ধারণাই ছিল না। মহানবী (সা.)-এর আগমনের খবর পেয়ে কতিপয় মুসলমান স্বাগত জানানোর জন্য মদীনার বাইরে চলে আসে। 'রওয়াহা' নামক স্থানে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাদের আনন্দ দেখার মতো ছিল। তারা মহানবী (সা.)-কে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য অভিবাদন জানাতে থাকেন। এরপর মহানবী (সা.) মদীনায় আসেন। সেখানে উপস্থিত সকল মুসলমান তাঁকে (সা.) স্বাগত জানায়।

(দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩৩-২৩৪)

এই যুদ্ধে গণিমতের মালের বিষয়ে এভাবে বর্ণিত আছে যে, উক্ত বিজয়ের ফলে মুসলমানদের হাতে গণিমতের মাল হিসেবে একশ পঞ্চাশটি উট এবং দশটি ঘোড়া আসে। এছাড়া সবধরনের সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-আশাক আর অগণিত পশুর রঙ করা চামড়া এবং উল ইত্যাদি ছিল যেগুলো মুশরিকরা নিজেদের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫২)

মহানবী (সা.) নিজের জন্যও সাহাবীদের সমপরিমান অংশ নির্ধারিত করেন। এ যুদ্ধে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে) একটি তরবারি সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন এবং আবু জাহলের সম্পদ থেকে একটি উট মহানবী (সা.) লাভ করেছিলেন যার নাকে রুপার নথ পরানো ছিল।

(গাযওয়াতুন নবী, প্রণেতা- মৌলানা আবুল কালাম আযাদ, পৃ: ৪৩-৪৪)

উক্ত তরবারি এবং উটকে জীবনী গ্রন্থাবলীতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, যে তরবারির বিষয়ে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেটির নাম ছিল 'যুলফিকার' এবং এর মালিক ছিল আস বিন মুনাব্বা' বিন হাজ্জাজনামক এক মুশরিক, যে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়। কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী উক্ত তরবারি ছিল আবু জাহলের। মহানবী (সা.) উক্ত তরবারির নাম যুলফিকার বলবৎ রাখেন। যুলফিকার নাম রাখার কারণ হিসেবে যে যুক্তি দেয়া হয়েছে তাহলো , সেই তরবারির কিছু অংশ দাঁত সদৃশ বানানো ছিল বা খোদাইকৃত লাইন ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭) (দায়েরায়ে মারেফ ইসলামিয়া, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৬) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪)

উক্ত তরবারির বিষয়ে লেখা আছে, সেটি পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কখনো পৃথক হয় নি। বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.) সেই তরবারি সবসময় নিজের কাছে রাখতেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সেই তরবারি আব্বাসী খলীফাদের তত্ত্বাবধানে থাকে।

(শরাহ যিরকানী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮৫-৮৭)

একইভাবে আবু জাহলের যে উট মহানবী (সা.) বদর যুদ্ধের মালে গণিমত হিসেবে পেয়েছিলেন, সেটি মহানবী (সা.)-এর কাছেই ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.) সেটিকে কুরবানীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যান। এ বিষয়ে একটি ঘটনা জানা যায় যে, সেই উট হুদায়বিয়ার প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছিল এবং একসময় সেটি পালিয়ে যায় আর আবু জাহলের ঘরে গিয়ে ওঠে। হযরত আমর বিন আনআমা আনসারী (রা.) সেটির পিছু নেয় কিন্তু মক্কার কতিপয় ক্ষেপাটে লোক সেটি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সুহায়েল বিন আমর যে হুদায়বিয়ার সময় কুরাইশের প্রতিনিধি ছিল, সে তাদেরকে সেই উট ফেরত দেওয়ার আদেশ দেয়, ফলে সেটি ফেরত দেওয়া হয়। সে তাদেরকে বলে, তোমরা এর পরিবর্তে একশ উট দেয়ার প্রস্তাব দাও। মুসলমান যদি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয় তাহলে তোমরা এই উট রেখে দিতে পারো, অন্যথায় এই উট ফেরত দিতে হবে। মহানবী (সা.) (উক্ত প্রস্তাব শুনে) বলেন, আমরা যদি এটিকে কুরবানীর পশুগুলোর অন্তর্ভুক্ত না করতাম তাহলে তাহলে আমরা ঠিকই এটিকে ফেরত দিতাম। কিন্তু এটিকে যেহেতু পূর্ব থেকেই কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাই এখন আর ফেরত দেয়া সম্ভব না। অতএব তিনি (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এটিকে জবাই করে দেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫৭) (গাযওয়াত নবী, প্রণেতা০ আল্লামা হালবী পৃ: ৪২৯)

গণিমতের মাল বিতরণের সময় মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধে শাহাদতবরণকারীদেরউত্তরাধিকারীদেরকে শহীদগণের অংশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে মদীনায় যাদের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন অথবা কতিপয় সাহাবী যাদের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তাদেরকেও (গণিমতের মাল থেকে) অংশ দেওয়া হয়, কেননা তারা একারণে যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি।

(গাযওয়াত নবী, প্রণেতা০ আল্লামা হালবী পৃ: ১৪৩-১৪৪)

বদরের যুদ্ধের বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ নেওয়া এবং সাহাবীদের মতামত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সেই বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। মুক্তিপণের পরিমাণ ছিল চার হাজার থেকে এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত। তথাপি যারা মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখতো না তাদের জন্য শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যদি মদীনার শিশু-কিশোরদের পড়ালেখা শিখিয়ে দেয় তাহলে তারা মুক্ত হয়ে যাবে। একইভাবে কতিপয় বন্দিকে সামান্য পরিমাণ মুক্তিপণ বা মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬৮)

মুক্তিপণের বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের রেওয়ায়েত রয়েছে, এ বিষয়ে কতিপয় রেওয়ায়েত অযৌক্তিকঅস্পষ্টতার জন্ম দেয়। বিষয়টির সঠিক সমাধান হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুঁজে বের করেছেন। যাহোক, প্রথমে পুরো কথা বর্ণনা করে দিচ্ছি। ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ এমনকি হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও বদরের যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান সেগুলো বেশ বিভ্রান্তিকর।

প্রকৃত ঘটনা হলো, মহানবী (সা.) মুক্তিপণ গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন তা ছিল একান্ত ঐশী অভিপ্রায় অনুযায়ী। সাধারণ বর্ণনানুযায়ী এটি যদিও আমি পূর্বে হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময় বর্ণনা করেছি কিন্তু এখানে বর্ণনা করাও আবশ্যক মনে হয়, তাই বর্ণনা করছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তারা যখন বন্দিদের আটক করেন অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন বন্দিদের আটক করেন তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, এই বন্দিদের বিষয়ে তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! তারা আমাদের চাচাতো ভাই এবং আত্মীয়স্বজন। আমার মতে আপনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে নিন। তারা আমাদের জন্য সেসব কাফিরের মোকাবিলায় শক্তিমত্তা (বৃদ্ধির) কারণ হবে আর খুব সম্ভব অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দিবেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার মতামত কি? হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে একমত নই বরং আমার মতামত হলো, আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা এদের শিরচ্ছেদ করি, তাদেরকে হত্যা করি। আলীর হাতে আকীলকে সোর্পদ করুন যেন সে তার শিরশ্ছেদ করতে পারে এবং আমার কাছে অমুককে সোর্পদ করুন (যে বংশগতভাবে হযরত উমরের আত্মীয় ছিল) যেন আমি তার শিরশ্ছেদ করতে পারি কেননা এরা সবাই কাফিরদের নেতা এবং তাদের প্রধান। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

(রা.)'র মতামতকে প্রাধাণ্য দেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার কথাকে প্রাধান্য দেন নি। পুনরায় হযরত উমর (রা.) বলেন, পরের দিন আমি এসে দেখি মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.) বসে বসে কাঁদছেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন আপনাকে এবং আপনার সাথীকে কিসে কাঁদিয়েছে? যদি আমার কান্না আসে তাহলে আমিও কাঁদব নতুবা কমপক্ষে আপনাদের উভয়ের সাথে কাঁদো কাঁদো চেহারা ধারণ করবো। মহানবী (সা.) বলেন, আমার কান্নার কারণ হলো, তোমার সাথীরা আমার সামনে বন্দিদের মুক্তিপণ নেওয়ার ব্যাপারে যে প্রস্তাব দিয়েছিল সেটি। আমার সামনে তাদের শাস্তি এই গাছের চেয়ে অধিক নিকটতর দেখানো হয়েছে {সেই গাছটি মহানবী (সা.)-এর অতি নিকটেই ছিল} আর আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ (সূরা আল্ আনফাল: ৬৮) অর্থাৎ পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া কাউকে বন্দি করা কোনো নবীর জন্য সমীচীন নয়। এরপর আরো দুই আয়াত পরে বলেছেন, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (সূরা আল্ আনফাল: ৭০) অর্থাৎ যে মালে গণিমত তোমরা লাভ করবে সেগুলো থেকে হালাল ও পবিত্র অংশ খাও। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য গণীমতের সম্পদ বৈধ করে দিয়েছেন। এটি সহীহ্ মুসলিমের একটি রেওয়ায়েত।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সেইর, হাদীস-৪৫৮৮)

এই হাদীসের প্রথমদিকের শব্দগুলো অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র ক্রন্দন এবং এরপর পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতের শব্দাবলীর বর্তমানে এ রেওয়ায়েতটি অস্পষ্ট মনে হয়, বুঝা যায় না যে, কী বলা হচ্ছে? যাহোক, এই বর্ণনাকে সঠিক ধ রে নিয়ে অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ, জীবনী গ্রন্থ ও মুফাসসিররা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন বদরের যুদ্ধের বন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নেওয়ার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং হযরত উমর (রা.)'র মতামতকে পছন্দ করেছেন। হযরত উমর (রা.)'র জীবনচরিত প্রণেতারা পৃথক শিরোনামে, হযরত উমর (রা.)'র মতামতের প্রেক্ষিতে কুরআনের যেসব নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো লিখতে গিয়ে এটিকেও সেসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেন যে, বদরের যুদ্ধের বন্দিদের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)'র প্রস্তাবকে আল্লাহ্ তা'লা প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু এটি একটি অস্পষ্ট কথা। এর কিছুই বুঝা যায় না। মনে হয়, জীবনীকার এবং মুফাসসিররা এ বিষয়টি ভুল বুঝেছেন। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটির ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তা তাঁর অপ্রকাশিত তফসীরের নোটে পাওয়া গিয়েছে যা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে এবং সেসব রেওয়ায়েতকে খণ্ডন করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র যে ব্যাখ্যা তা সঠিক বলে মনে হয়। অযথাই হযরত উমর (রা.)'র মর্যাদা উঁচু করার জন্য মনে হয় কতক মুফাসসির এসব বর্ণনা বানিয়েছেন বা এটিকে ভুল বুঝেছেন। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেন, ইসলামের পূর্বে আরবের রীতি ছিল, আর পরিতাপের বিষয় হলো আজো! পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ রীতি চলে আসছে যে, যুদ্ধ ও লড়াই না হলেও মানুষকে বন্দি করা হয়। তাদের গোলাম বানানো হয়। {এটি সে যুগের কথা যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই নোট লিখেছিলেন।} এই আয়াত সেই কুৎসিত প্রথাকে রহিত করে এবং স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করে যে, কেবল যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের পরই শত্রুপক্ষের লোকদের বন্দি করা যেতে পারে। যুদ্ধ যদি না হয় তবে কাউকে বন্দি করা বৈধ নয়। এ আয়াতের অনেক বড়ো ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানরা যখন বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কাবাসীদের কতককে বন্দি করে তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন, তাদের বিষয়ে কী মীমাংসা করা যায়? হযরত উমর (রা.)'র মতামত ছিল, তাদেরকে হত্যা করা উচিত; হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামত ছিল, মুক্তিপণ নিয়ে (তাদেরকে) ছেড়ে দেওয়া উচিত। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র পরামর্শ পছন্দ করেন এবং এটি সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াত, যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো নবীর জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবে। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটির ব্যাখ্যা করতে গিয়েই বলেন, যে মতামত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে হযরত আবু বকর (রা.)'র মত ভিন্ন ছিল, হযরত উমর (রা.)'র মত ভিন্ন ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামত গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেন কিন্তু মুফাসসিররা বলেন, এইআয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন যেন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর এ কাজকে অপছন্দ করেছিলেন। শুধু হযরত উমর (রা.)'র কথাকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করার জন্য এ রেওয়ায়েত রচনা করা হয়েছে, তাতে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাই ক্ষুন্ন হোক না কেন! যাহোক, তারা বলে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর কাজকে অপছন্দ করেছেন। বন্দিদের হত্যা করা উচিত ছিল এবং মুক্তিপণ নেওয়া উচিত হয় নি। এটি তাবারীর তফসীরে রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এই তফসীর ভুল। প্রথমত, সে সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা এমন কোনো নির্দেশ জারি করেন নি যে, বন্দিদের মুক্তিপণ নিয়ে যেন মুক্ত না করা হয়। তাই, ফিদিয়া গ্রহণ করার কারণে মহানবী (সা.) কোনোভাবেই দোষী হতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, ইতিপূর্বে মহানবী (সা.) নাখলাতে দু 'জন ব্যক্তির কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-এর এই কাজকে অপছন্দ করেন নি। তৃতীয়ত, কেবল দু'আয়াত পরেই খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন যে, মালে গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে তোমরা যা-ই লাভ করো তা ভোগ করো; তা হালাল এবং পবিত্র। এই বিষয়টি কল্পনাতীত যে, মহানবী (সা.)-এর ফিদিয়া গ্রহণ করাকেখোদা তা'লা অপছন্দ করবেন আবার এভাবে অর্জিত অর্থ কে হালাল এবং পবিত্র আখ্যা দেবেন। কাজেই এই তফসীর-ই ভুল আর সঠিক তফসীর এটিই যে, এই আয়াতে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, বন্দিকে কেবল যু দ্ধের পরিস্থিতিতেই আটক করা যেতে পারে যখন শত্রুপক্ষকে মোক্ষম আঘাত হেনে পরাস্ত করা হয়।

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)এর দরস (অপ্রকাশিত), সূরা আনফাল, রেজিস্টার নম্বর, ৩৬, পৃ: ৩৯-৯৬৯]

এর সাথে হযরত উমর (রা.)'র এই মতামতের কোনো সম্পর্ক নেই যে, ফিদিয়া যেন গ্রহণ না করা হয়। পবিত্র কুরআনের মুফাসসিরদের মাঝে আল্লামা ইমাম রাযী (রহ.) এবং প্রসিদ্ধ জীবনীকার আল্লামা শিবলী নোমানীও একই মত প্রকাশ করেন যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন।

(তফসীর কবীর, আল্লামা ইমরা রাজি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮) (সীরাতুন নবী (সা.) প্রণেতা- আল্লামা শিবলী নুমানী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এম.এ. সাহেবও এ প্রসঙ্গে লিখেন, মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) বন্দিদের ব্যাপারে পরামর্শ করেন যে, তাদেরকে কী করা উচিত? আরবে সাধারণত বন্দিদেরকে হত্যা করা অথবা স্থায়ীভাবে দাস বানিয়ে নেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু মহানবী (সা.) -এর পূত-পবিত্র প্রকৃতির কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত অসহ্য ছিল। তাছাড়া এ ব্যাপারে তখনো কোনো ঐশী বিধানও অবতীর্ণ হয় নি। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমার মতে মুক্তিপণ নিয়ে এদেরকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত,কেননা (যাই হোক না কেন) এরা আমাদেরই আত্মীয়স্বজন আর হতে পারে, আগামীতে এদের মধ্য হতে ইসলামের তরে নিবেদিত মানুষ সামনে আসবে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) দ্বিমত করেন এবং বলেন, ধর্মীয় ব্যাপারে আত্মীয়তার নামে কোনো ছাড় দেওয়া উচিত নয় আর এরা এদের কৃতকর্মের দরুণ হত্যাযোগ্য হয়ে গেছে। কাজেই আমার মতে, এদের সবকটাকে হত্যা করা উচিত বরং আদেশ দেওয়া উচিত, মুসলমানরা যেন নিজ হাতে নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করে। মহানবী (সা.) আপন স্বভাবসুলভ দয়ার্দ্রতার কারণে হযরত আবু বকর (রা.)'র মতামতকে পছন্দ করেন আর হত্যার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন আর আদেশ দেন যে, যেসব মুশরিক ফিদিয়া বা মুক্তিপণ প্রদান করবে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। অতঃপর তদনুযায়ী ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয়। ফিদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে যখন ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হয় যেমনটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও লিখেছেন সেখানে আবার হাদীসকে কেন্দ্র করে মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র ক্রন্দনের যুক্তি উপস্থাপন করা অসঙ্গত মনে হয়। যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম.এ. লিখেন, অতঃপর প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী ১ হাজার থেকে আরম্ভ করে ৪ হাজার দিরহাম পর্যন্ত ফিদিয়া নির্ধারণ করা হয় আর এভাবে বন্দিরা মুক্ত হয়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬৭-৩৬৮)

অবশিষ্টাংশ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

জুমু'আর পরে দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমজন হলেন মুরুব্বী সিলসিলাহ্, রানা আব্দুল হামীদ খান কাঠগড়ি সাহেব; যিনি পাকিস্তানে ওয়াকফে জাদীদেরনাযেব নাযেম মাল ছিলেন। সম্প্রতি ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম চৌধুরী আব্দুল লতীফখান কাঠগড়ি সাহেব এবং মায়ের নাম আমাতুল লতীফ সাহেবা। তাঁর পিতাও জামা'তের

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী কর্মী ছিলেন। আব্দুল হামীদ খান সাহেবের দাদা হযরত চৌধুরী আব্দুল মান্নান খান সাহেব এবং তাঁর দাদার বড়ো ভাই হযরত চৌধুরী আব্দুস সালাম খান কাঠগড়ি সাহেবের মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন হয়, যারা ১৯০৩ সালেহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আব্দুল হামীদ খান কাঠগড়ি সাহেব ১৯৭৯ সনের মে মাস থেকে মুরব্বী হিসেবে (জামা'তের) সেবা করাআরম্ভ করেন। বিভিন্ন স্থানে তার কাজ করার সুযোগ হয়েছে- পাকিস্তানেও এবং বহির্বিশ্বেও। ওকালতে তবশীরের অধীনে আগস্ট ১৯৮৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৬ পর্য ন্ত উগাণ্ডাতে ছিলেন। এরপর ওয়াক্ফে জাদীদের নেযামত ইরশাদের অধীনে বিভিন্ন স্থানে মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এরপর ১৯৯৩ সনে ওয়াক্ফে জাদীদের নায়েব নাযেম মাল নিযুক্ত হন, যেখানে তিনি আমৃত্যু সেবা করেছেন। তিনি ৪৪ বছর জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাকে আল্লাহ তা'লা এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান দান করেছেন। এক পুত্র ডাক্তার আব্দুর রউফ খান সাহেব বর্তমানে সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্ক।

তার পুত্র ডাক্তার আব্দুর রউফ খান সাহেব বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা সর্বদা ওয়াক্ফের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। উগাণ্ডাতে যখন ছিলেন তখন সেখানে বিদ্রোহীরা ক্ষমতা দখল করে এবং বিদেশীদের (দেশ থেকে) বের করে দেয়- এটিই তার সেখান থেকে দ্রুত ফেরত আসার কারণ ছিল। উগাণ্ডায় কাজ করার সময় আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে সেখানকার মিশনারী ইনচার্জ মাহমুদ বিটি সাহেব পবিত্র কুরআন দিয়ে কাম্পালাতে তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সে সময় সেখানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। লোকেরা এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই এলাকা ছাড়ার সময় আমার শ্রদ্ধেয় পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিকটে হাসপাতাল না থাকার কারণে এবং চিকিৎসার সুযোগ না থাকায় লোকেরা তার পিতাকে সেখানে একটি কক্ষে ছেড়ে চলে যায়। (এরপর) সেই এলাকাটি বিদ্রোহীরা দখল করে নেয়। বিদ্রোহীরা সেখানে কেউ আছে কি-না তা দেখার জন্য সর্বত্র তল্লাশী চালায়। সে সময় এক বিদ্রোহী তার কক্ষে প্রবেশ করে যেখানে হামীদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন কিন্তু শুয়ে ছিলেন এবং হামীদ সাহেবকে মৃত মনে করে তারা তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। আমার পিতা বলতেন, আমি নিচে জানালার একেবারে পাশে শুয়ে ছিলাম এবং জানালা দিয়ে গুলি আসছিল এবং সামনের দেয়ালে গিয়ে বিদ্ধ হচ্ছিল। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলে কিছু পরিচিত লোকদের সাথে যোগাযোগ হয় আর তারা আমার পিতাকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করেন।

খিলাফতের সাথে সীমাহীন হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। খুবই সাদাসিধে ও মিশুক মানুষ ছিলেন। খুতবাতে যা বলা হতো, যুগ খলীফার প্রতিটি কথায় লাব্বাইক বলতেন। কোনো ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। কেউ ব্যাখ্যা করলে যে এর অর্থ এমন, উদ্দেশ্য এটি তাহলে খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। কর্মকর্তা ও মুরব্বীদের নিজেও সম্মান করতেন এবং তার পুত্র বলেন, আমাকেও তাগাদা দিতেন। তিনি বলেন, আমি যখন আতফালুল আহমদীয়ার সংগঠনে ছিলাম তখন একবার বলেন, যদি তুমি কর্মকর্তা ও মুন্তাযেম আতফালের কথা না মানো, অর্থাৎ কোনো কথায় তিনি মতভেদ করে থাকবেন হয়ত, তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দাও। তিনি বলতেন, জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটির কথা শুনবে অথচ অপরটির কথা শুনবে না, এটা হতে পারে না। অন্যদের সাহায্য করা এবং সময়োপযোগী সংশোধন করা তার বিশেষ গুণ ছিল। একারণে কেউ অসন্তুষ্ট হলেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। সংশোধন হয়ে গেলে তার মন জয় করতেন আরবলতেন, শুধু সংশোধন করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তিনি লিখেন, এমন অনেক সময় এসেছে যখন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারতো। কিন্তু তিনি সর্বদা ওয়াক্ফকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শেষ বয়সে আমিও শ্রদ্ধেয় পিতাকে কথায় কথায় বলি ডেনমার্কে আমার কাছে চলে আসুন। তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন আর বলেন, আমি (কয়েকটি) বছর উৎসর্গ করি নি বরং জীবন উৎসর্গকরেছি। আমার সবকিছু ওয়াক্ফের সাথে সম্পৃক্ত।

তার কন্যা হাফেযা হুসনে আরা বলেন, আমার পিতা অত্যন্ত কোমল হৃদয়, স্নেহশীল, অতিথি পরায়ণ এবং খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। দোয়ার এক ভাণ্ডার ছিলেন। আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।এছাড়া খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসাও ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার এক বিশেষ ধরণ তার মাঝে দেখা যেতো যা সকল সম্পর্কের ওপর ছাপিয়ে যেতো। সবসময় চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু আর কথার সূচনা ও সমাপ্তি হতো কেবলমাত্র খিলাফত এবং খলীফার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার মাধ্যমে। তিনি বলেন, এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যেও মাঝে মাঝে আসলে আমি যখন আবেগাপ্লুত হয়ে যেতাম তখন বলতেন, পৃথিবীর সকল সম্পর্কই নশ্বর। তুমি কেবলমাত্র আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক অটুট রাখো। বাকি সকল আত্মীয়রা ছেড়ে চলে যায় কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই অবিনশ্বর যিনি কখনো একা ছেড়ে যান না। এছাড়া বলেন, সর্বদা খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রেখো। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সর্বদা বলতেন, আমি একজন ওয়াক্ ফে যিন্দেগী। আমার পুরো জীবন উৎসর্গিত। আর শেষ নিঃশ্বাস অবধি ওয়াক্ফের দায়িত্ব পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করতেন।

নাযেম মাল, ওয়াক্ ফে জাদীদ - হাফিয খালিদ ইফতেখার সাহেব লিখেন, আব্দু ল হামিদ খান সাহেবের সাথে প্রায় বিশ বছর কাজ করার সুযোগ লাভ করেছি। তিনি সবসময় এক প্রকৃত জীবন ওয়াক্ফে যিন্দেগীর ভূমিকা পালন করেছেন। বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে তিনি আমার চেয়ে বড় ছিলেন। কিন্তু খিলাফতের আনু গত্য এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার পরম মার্গেও আনুগত্যকারী হওয়ার কারণে কখনো জ্যেষ্ঠতার বড়াই করেন নি।ইনি তার সহকারী ছিলেন। তিনি বলেন, নিঃস্বার্থভাবে এই অধমের সাথে তিনি কাজ করেন। তাঁর বোঝানোর ও চাঁদার আহ্বান জানানোর রীত ছিল অত্যন্ত চিত্তকর্ষ ক। তিনি নবাগত কর্মীএবং মুরব্বী, মুয়াল্লিমদের প্রজ্ঞার সাথে কাজ করার পদ্ধতি বুঝাতেন। তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করতেন। সুচিন্তিত ও সঠিক মতামত রাখতেন। যদিও নীরবে এবং নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছেন কিন্তু ত্রিশ বছরেরও অধিককাল তার মাধ্যমে ওয়াক্ফে জাদীদ বিভাগ অনেক উপকৃত হয়েছে। (জীবনের) শেষ কয়েক বছরে অনেক সময় শরীর খারাপ হয়ে যেত, সন্তানরা প্রবাসে ছিল। কখনো যদি কেউ বলতো যে, কোনো এক সন্তানের কাছে চলে যান তাহলে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বলতেন, আমি জীবন উৎসর্গ করেছি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেবা করবো। আল্লাহ্ তা'লা তাকে শেষ নিঃশ্বাস অবধি এই অঙ্গীকার পালনের সৌভাগ্য দিয়েছেন।

অর্থ বিভাগের মুরব্বী সিলসিলাহ্ মোবাশ্বের আহমদ সাহেব বলেন, ২০১৩ সালে ওয়াক্ফে জাদীদের অর্থ বিভাগে আমার পদায়ন হয়। আবদুল হামীদ খান সাহেব দু 'টি মৌলিক নির্দেশনা দিয়ে বলেন, এই দু 'টি বিষয় তোমার ডায়েরিতে টুকে নাও। প্রথমত, সকল কল্যাণের উৎসস্থল হলো খিলাফত। যেকোনো অবস্থায় আর যেকোনো মূল্যে খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কাজে কখনো আলস্য হলে সেটি ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু মিথ্যা ও বানোয়াট কথার কোনো ক্ষমা নেই। কখনো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলবে না। এই দু'টি নীতিকে হৃদয়ে গেঁথে নাও। আর বিশেষ করে সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে থাকা এবং দোয়া করতে থাকা, এটি তো আমাদের সবারই ঈমান ও বিশ্বাসের বিষয়।তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন সফরে আমি তার সাথে থাকতাম। বার বার জোর দিয়ে বলতেন, চাঁদার আহবান জানানোর সময় কোনো ব্যক্তিকে ওয়াক্ফে জাদীদের গুরুত্ব সম্পর্কে এতটাঅবগত করতে হবে যাতে আর্থি ক কুরবানী করার ক্ষেত্রে তার মাঝে আর কোনো দ্বিধা না থাকে। কেবল অর্থ চাওয়াই নয়, বরং চাঁদার গুরুত্ব তার হৃদয়ে প্রোথিত করতে হবে। তার মাঝে জামা'তের প্র তি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এরপর তার কাছে তার সাধ্যানুযায়ী চাঁদা চাইতে হবে। আর এক্ষেত্রে লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমাদের কাজ জামা'তের সেবা করা আর জামা'তের খাতিরে সহায়তা ে নয়া। জামা'তের সম্পদের প্রতি খেয়াল রাখতেন, বলতেন- জামা'তের সদস্যদের কু রবানীর ফলে চাঁদা আসে; এই অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে আমাদের সাশ্রয়ী হওয়া উচিত। যতটুক প্রয়োজন ততটুকুই যেন খরচ করা হয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন খরচ করা না হয়। তিনি বলতেন, আমি আমার পুত্রকে বলেছি যতক্ষণ পর্য ন্ত তুমি জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে ততক্ষণ তুমি আমার পুত্র। এছাড়া তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক বা দাবি নেই। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, (তার) মর্যাদা উন্নীত করুন। তার পুণ্যসমূহ তার সন্তানদের মাঝে বহাল রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ ও জানাযা আমেরিকা নিবাসী মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব মোবাশ্বের আহমদ সাহেবের স্ত্রী নুসরাত জাহাঁ আহমদ সাহেবার। ইনিও সম্প্র তি ইন্তে কাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মরহুমা ১৯৭২ সনে স্বামী মোবাশ্বের আহমদ সাহেব ও তিন সন্তান সহ আমেরিকায় স্থানান্তরিত হন এবং ওয়াশিংটনে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯৮৮ সনে তার স্বামী আমেরিকায় জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ লাভ করেন । মরহুমা তার পুরো জীবন সাদাসিধে ভাবে এবং কৃতজ্ঞতার মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। তার স্বামী মোবাশ্বে র সাহেব যখন জীবন উৎসর্গ করেন তখন থেকেই তিনি মুরুব্বীর দায়িত্ব পালন করছেন। খুবই সাদামাটাভাবে এবং কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে তিনি স্বামীর সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন। মরহুমা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মূ সীয়া ছিলেন। নিয়মিত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে চাঁদা প্রদানকারিণী ছিলেন এবং খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। ১৯৭৭ সন হতে ২০০৭ সন পর্যন্ত তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্র বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। স্থানীয় নায়েব সদর, সদর ও রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ইসলাম আহমদীয়াতকে প্রসারেরজন্য কঠোর পরিশ্র মের সাথে তবরিগী প্রোগ্রাম প্রণয়ন করতেন। লাজনা ও নাসেরাতদের তালীম-তরবীয়তের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। নিজের সন্তানদের উত্তম ধর্মীয় তরবীয়ত দিয়েছেন। একইভাবে জাগতিক শিক্ষাদীক্ষায় মনোযোগী করেছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়া দুই পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুমার ৪ সন্তানই জামা'তের সক্রিয় কর্মী, তারা ধর্মসেবার সুযোগ পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি দয়া ও ক্ষমা সুলভ আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকেও তার দোয়া ও পুণ্যের উত্তরাধিকারী করুন। (আমীন)

****

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের একজন সদস্য হিসেবে আপনার দায়িত্ব হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বাণী তথা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে দেশে দেশে পৌঁছে দেওয়া।

খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং সমৃক্ততা আমাদের ঈমানের উন্নতির জন্য, ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, আমাদের উচিত এই খিলাফত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে নিজেদের পরিপূর্ণ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গিত করা।

প্রত্যেক খাদিমকে নিয়মিত জুমআর খুতবা শোনা এবং খুতবায় দেওয়া উপদেশ বলী মেনে চলা নিজের উপর অনিবার্য করে নেওয়া উচিত।

এই খুতবাগুলি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎসমুখ যা ধর্মীয় দিক থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক বিকাশের আনুষঙ্গিকতাগুলিকে পূর্ণ করে।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৫০ তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশেষ বার্তা।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রিয় সদস্যগণ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আপনাদের সদর সাহেব ৫০তম সালানা ইজতেমা উপলক্ষ্যে লিখিত কোন বার্তা পাঠানোর আবেদন জানিয়েছিলেন।

এই আশিসময় উপলক্ষ্যে আমার বার্তা হল আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে হুযুর (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন যাতে ইসলামের প্রকৃত মর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় যা মানব সৃষ্ট আইন, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুপ্রথা ও অন্ধবিশ্বাসের বলি চড়েছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মানবজাতির সামনে ইসলামের প্রকৃত বাণী তুলে ধরেছেন এবং সকল সত্যান্বেষীদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন ও হিদায়াতের আলোকে আলোকিত করেছেন।

তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফতের আশিসময় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এই উদ্দেশ্যেই। খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াত পূর্ণ শক্তিতে প্রসার লাভ করছে আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা আনীত হিদায়াতের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। অতএব, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের একজন সদস্য হিসেবে আপনার দায়িত্ব হল হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বাণী তথা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে দেশে দেশে পৌঁছে দেওয়া। আর এটা তখনই সম্ভব যখন আপনাদের আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার উন্নত মান অর্জন কারী হবেন,যেমনটি কুরআনকরীম এবং আঁ হযরত (সা.) এর আদর্শ আমাদের শেখাই।

আহমদীয়াত প্রসাসের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম হল আত্মসংশোধন। ইসলাম প্রত্যেক জটিলতার এক আধ্যত্মিক সমাধান উপস্থাপন করেছে আর আত্মসংশোধনের উপায় বলে দিয়েছে। প্রত্যহ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা, কুরআন করীমের তিলাওয়াত করা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি আদেশ মান্য করা আত্মসংশোধন এবং হৃদয়ে পরিরবর্তনের জন্য সব থেকে কার্যকর উপায়। শুধু তাই নয়, এগুলো আমাদের ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা প্রত্যেক আহমদীকে সুষ্ঠুভাবে পালন করা উচিত।

এছাড়াও খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং সমৃক্ততা আমাদের ঈমানের উন্নতির জন্য, ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, আমাদের উচিত এই খিলাফত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে নিজেদের পরিপূর্ণ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গিত করা। শুধু তাই নয়, এর বরকতের ছায়া তলে এমন এক পরিবেশও সৃষ্টি করা উচিত যাতে ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিকশিত হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যেক খাদিমকে নিয়মিত জুমআর খুতবা শোনা এবং খুতবায় দেওয়া উপদেশ বলী মেনে চলা নিজের উপর অনিবার্য করে নেওয়া উচিত। কেননা, এই খুতবাগুলি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎসমুখ যা ধর্মীয় দিক থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক বিকাশের আনুষঙ্গিকতাগুলিকে পূর্ণ করে।

এর পাশাপাশি পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করাও আবশ্যক। খোদা প্রদত্ত খিলাফতের ছত্রছায়ায় থেকে আমাদের উচিত তাঁর ভালবাসা অর্জন করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানবতার সেবা করা।

আমি আশা করি, আমার এই বার্তা আপনাদের ঈমানের উন্নতির কারণ হবে এবং ইসলাম আহমদীয়াতের এই বাণী আপনাদের দেশেই প্রসারিত হবে না, বরং অন্যান্য সমাজেও বিস্তার লাভ করবে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের ইজতেমাকে সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন আর এর সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হোন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হোন এবং আপনাদেরকে স্বীয় ভালবাসার বাহুপাশে আবদ্ধ রাখুন। আমীন।

ওয়াসসালাম,

খাকসার

(মির্যা মসরূর আহমদ)

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

(১ম পাতার পর.....)

উপসংহারে পৌঁছনো যায় যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবী বিভিন্ন বস্তসমূহের সমষ্টি নয়, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন যেন একই শৃঙ্খলের এক একটি আংটা। একটি আংটা বের করে দিলে সেটি আর শৃঙ্খল থাকে না। অনুরূপভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে একটি বস্ত বের করে দিলে সমস্ত জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। সমুদ্রকে শুকিয়ে দিয়ে পানি শেষ হয়ে যাবে আর নদী শুকিয়ে দিলে সমুদ্র শুকিয়ে যাবে। নদীর জন্য গতিপথ তৈরী করে সেই উতরাই সমান করে দিলে সমস্ত জগতের পানি ছড়িয়ে পড়বে আর পৃথিবী বসবাসযোগ্য থাকবে না। পর্বত সরিয়ে দিলে ভূমিকম্প হয়ে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। নদ-নদীর জন্য জলরাশি অবশিষ্ট থাকবে না আর সমস্ত পানি একত্রে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। একদিকে পৃথিবীতে বন্যা দেখা দিবে অপরদিকে সারা বছর জলের সহজলভ্যতা বজায় থাকবে না। চাঁদ-সূর্য সরিয়ে দিলে পৃথিবীর সৃষ্টি-শৃঙ্খলার উপর তাদের যে প্রভাব ছিল তা বিলুপ্ত হবে আর পৃথিবীর অবস্থা আগের মত থাকবে না। সূর্যকে পৃথক করে দিলে মেঘের শৃঙ্খলা থাকবে না আর মানুষ পানির জন্য হাহাকার করবে। শাক-সব্জি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষের স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে এবং প্রাণীজ খাদ্য তৈরীর প্রক্রিয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। মোটকথা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একত্রে মানুষের সেবায় নিয়োজিত, এর প্রতিটি অংশ অপর অংশকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যম। এমনটি হলে দুই খোদার মতবাদটি কিভাবে সঠিক হতে পারে? পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যদি একাধিক খোদা হত,তবে কোন অংশটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে সেটি অন্য থেকে আলাদা আর তাতে বোঝা যেতে পারে যে, সেটি অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে? আর যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি শৃঙ্খলে সন্নিবিষ্ট থাকে, তবে এর স্রষ্টা হিসেবে একজন খোদাকেই স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় একথা বলতে হবে যে, খোদা তা'লার মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি ছিল না। এইজন্য একাধিক খোদা মিলে কাজ ভাগ করে নিয়েছে এবং পূর্ব প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের নিজের অংশের কাজ পূর্ণ করেছে। কিন্তু মুশরিকরাও এমন মতবাদ পোষণ করে না আর তা বাস্তববুদ্ধির পরিপন্থী। কেননা অসম্পূর্ণ সত্তা খোদা হতে পারে না। অতএব এই প্রমাণের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনিই তোমাদের খোদা, যিনি এক ও অদ্বিতীয়।

খোদা তা'লা ছাড়া কেউ অদৃশ্যের সংবাদ জানতে পারে এমন সত্তার দাবিকে এই আয়াতের দ্বারা সূক্ষ্ম কৌশলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মুসলমানদের মধ্যে এই শিক্ষা বিদ্যমান থাকতেও এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা করে ব বসে আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) অদৃশ্যের সংবাদও জানতেন আর তিনি পাখিও সৃষ্টি করতেন। অথচ আল্লাহ্ তা'লা এখানে স্পষ্ট বাক্যে বলছেন, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া যতগুলি সত্তার উপাসনা করা হয়, সেগুলি মধ্যে একটিও কোন কিছু সৃষ্টি করার শক্তি রাখে না। হযরত ঈসা (আ.) সেই সমস্ত সত্তার অন্তর্ভুক্ত যাকে লক্ষ কোটি মানুষ উপাসনা করে।

স্রষ্টা হওয়ার পাশাপাশি পথপ্রদর্শনকারী সত্তার জন্য জীবিত হওয়াও প্রয়োজনীয় শর্ত, যাতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে সংশোধন করতে পারে। এই দলিল দ্বারা মিথ্যা উপাস্যদের পথপ্রদর্শনকারী হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা যাদের উপাসনা কর তারা সকলে মৃত্যু বরণ করেছে। তারা কিভাবে পথপ্রদর্শনকারী হতে পারে! যদি এই যুগে কোন বিকৃতি দেখা দেয় তবে কিভাবে তার সংশোধন হবে? আশ্চর্যের বিষয় হল মুসলমানদের মধ্যে এই নির্দেশের বিরুদ্ধেও মতবাদ তৈরী হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ হযরত ঈসা (আ.) কে জীবিত বলে বিশ্বাস করে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কুরআন মজীদের যুগে যতসব মিথ্যা উপাস্য ছিল তারা সকলেই মারা গেছে। অতএব, এরা যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) কে উপাস্য বলে মান্য করত, তাই এই ঐশী সাক্ষ্য অনুসারে তারা কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছিল। আর যদি তাদেরকে জীবিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, নাউযু বিল্লাহ্ তারা মিথ্যা উপাস্য ছিল না। বরং সত্যিকার খোদা ছিল। নাউযু বিল্লাহ মিন যালিক।

এই দুটি আয়াতে শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা শিরকেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এর চারটি দলিল দেওয়া হয়েছে।

১) লা- ইয়াখলুকুনা। অর্থাৎ তারা সৃষ্টি করে না। অথচ খোদা হওয়ার জন্য স্রষ্টা হওয়া আবশ্যিক শর্ত।

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

১১ পাতার পর.....

দাম্পত্য জীবনের বিবাদ-কলহ নিরসনে হুযূর আকদাস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

হুযূর (আই.) অপর এক স্থানে বলেন,

"আমাকে পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে আর এমন ঘটনাবলী শুনে খুবই কষ্ট লাগে, কখনো কখনো মন (একথা ভেবে) অস্থির হয়ে ওঠে যে, আমাদের কিছু লোক কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে? স্ত্রীর সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা ভুলে যায় এমনকি অনেকে এতটা নীচে নেমে যায় যে, স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে, তার ওপর চাপ প্রয়োগ করে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অথবা স্ত্রীর অর্থে কেনা বাড়িতে জোরপূর্বক অংশিদার সেজে বসে এবং তাকে লাগাতার হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। হতবাক হতে হয়, ভালো-ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলোরাওকখনো কখনো এমন আচরণ করে। এমন লোকদের উচিত কিছুটা হলেও আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং নিজেদের সংশোধন করা। অন্যথায় স্পষ্টভাবে জেনে নিন যে,জামাতের ব্যবস্থাপনার কাছে বিষয় এলে, ব্যবস্থাপনা কখনো এমন বাজে লোকদের সমর্থন করে না আর করবেও না।"

তিনি আরো বলেন, "সেসব পুরুষ যারা স্ত্রীদের ধন-সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি রাখে তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এইদায়-দায়িত্ব (অর্থাৎ ভরন-পোষণের দায়িত্ব) তাদের নিজেদের এবং স্ত্রীর অর্থে তাদের কোন অধিকার নেই। স্ত্রী-সন্তানের ব্যয় নির্বাহ করা পুরুষদের নিজেদের দায়িত্ব। তাই অবস্থা যা-ই হোক না কেন দিনমুজরি করে নিজের সংসারের খরচ নির্বাহ করতে হলেও সংসারের ব্যয় নির্বাহ করার দায়িত্ব তাদের। তারা যদি পরিশ্রমের পাশাপাশি দোয়াও করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বরকতও দিয়ে থাকেন এবং স্বচ্ছলতাও দান করেন।"

(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪)

"এখন আমি কিছুসাধারণ বিষয়ে কথা বলছি। যদি বিচ্ছেদ বা তালাক হয়ে যায় তাহলে কতিপয় লোক এখানকার আইনের আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীর অর্থে ক্রয় করা বাড়ির অর্ধেক নিজেদের নামে লিখিয়ে নেয়। আইনের চোখে তারা মালিক হয়ে যায় কিন্তু

আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তারা স্পষ্ট পাপাচারকরছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি স্ত্রীকে অঢেল সম্পদও দিয়ে থাকে তা ফেরত নেবে না- স্ত্রীর সম্পদ হরণ করা তো দূরের কথা।"

(খুতবা জুমাআ, ১০ নভেম্বর, ২০০৬)

বিবাহের সম্বন্ধ নির্ধারণ করার সময় তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রাখার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) এক জুমুআর খুতবায় বলেন,

"গত কিছুদিন পূর্বে জনৈক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন, আমার বিবাহ হচ্ছে না, পাকিস্তানের রিশতানাতা বিভাগ কোনো সহযোগিতা করছে না। আমি যখন রিপোর্ট সংগ্রহ করলাম তখন জানতে পারলাম, অনেকগুলো প্রস্তাব তারা দিয়েছেন কিন্তু তার পছন্দ হয় নি। এর কারণ হলো, সে বলেছে, বিবাহ হতে হবে আমার নির্ধারিত শর্তানুযায়ী। এই ব্যক্তি নিজে মেট্রিক পাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা সামান্য কিন্তু শর্ত দেয় যে, মেয়ে যেন শিক্ষিত হয় অর্থাৎ মেয়েকে মাস্টার্স পাস, চাকরিজীবি ও উপার্জনশীলা হতে হবে। বিয়েতে আমাকে বাড়িও দিতে হবে, দশ-বিশ লাখ নগদ টাকাও আমার হস্তগত হওয়া চাই এবং আমার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে অধিকন্তু শুধুব্যয়ভারই বহন করবে না বরং আমাকে কাজ করার জন্য শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা এবং মেয়ে কিছুই বলতে পারবে না; আমার যখন ইচ্ছে হবে কাজ করবো না হলে করবো না। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে মানসিক রোগী ছাড়া আর কী-ইবা বলা যেতে পারে! এমন প্রস্তাব এবং এমন ছেলেদের প্রতি তো রিশতানাতা বিভাগের ফিরেও তাকানো উচিত ছিল না। (জানি না তারা কেন তার প্রস্তাব পাঠানো অব্যাহত রেখেছে) কেননা, এমন লোকদের সাথে বোঝাপড়া করতে গিয়ে কোথাও না আবার রিশতানাতা বিভাগের কর্মীরা মানসিক রোগি হয়ে পড়ে।"

খুতবা জুমুআ, ১লা ডিসেম্বর, ২০০৬)

উপরোক্ত খুতবাতেই হুযূর (আই.) উভয়পক্ষের অন্যায় দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বলেন,

আক্ষেপ! মানুষ ভালোর সন্ধান করে অথচ নিজে ভাল কাজ করে না। কোন কোন জায়গায় বাস্তব পরিস্থিতি এভাবে দেখা যায় যে, বিয়ের সময় কিছুই বলে না এবং কোন শর্তও আরোপ করে না কিন্তু বিয়ের পর ব্যবহারিক আচরণ এমনই হয়ে যায়, এ মর্মে কারো কারো পক্ষ থেকে অভিযোগ আসে। মেয়ে পক্ষের কাছে অন্যায় চাহিদা বা দাবি-দাওয়া করতে থাকে, মনোপুত উত্তর না পেলে এবং চাহিদা পূরণ না হলে ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি (সৃষ্টি করে) এবং মেয়েরা খোঁটা-খোঁচা, ইত্যাদির সম্মুখীন হয়।

আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদেরকেও কাণ্ডজ্ঞান দান করুন এবং করুণা করুন। অতএব, একজন অজ্ঞ এবং দুরাচারী ছাড়া যে নিজের প্রাণের প্রতি অবিচার করেছে (কেননা মানুষের বিরুদ্ধে যেভাবে অবিচার করা যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কেউ অন্যায় করতে পারে না) অর্থাৎ এমন ব্যক্তি ছাড়া এ ধরনের কথা কে বলে, মূলত যে নিজের প্রাণের প্রতিই অবিচার করে। আল্লাহ্‌র রবুবিয়্যাতের গুণের কোন জ্ঞানই যে রাখে না, যে জানেই না যে আমাদের প্রভুআমাদের প্রতি কী কী অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে আমল করে সেসব দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি যা আমাদের প্রভুআমাদেরকে শিখিয়েছেন, তাছাড়া নয়। সূরা শুয়ারার তিন আয়াত সম্বলিত একটি দোয়া আছে যেখানে শিখানো হয়েছে,

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আমার সুখ্যাতি সুনিশ্চিৎ করে দাও এবং আমাকে নেয়ামতসমৃদ্ধ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। সুতরাং এমন লোক যারা নিজেদের প্রভুকে চিনে না এবং বিবেকবুদ্ধিহীন তাদের কথা-বার্তা শুনে সে দোয়াই করি যা আমাদের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) করেছিলেন। অতএব, আমাদেরকে সর্বদা আমাদের প্রভুর কাছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং সঠিক বিষয় অবলম্বনের এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়া করা উচিত। একই সাথে সৎকর্ম করার প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, যা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বারবার নসীহত করেছেন।

(খুতবা জুমআ, ১লা ডিসেম্বর, ২০০৬)

২০০৪ সনে ইউ.কে জামা'তের বার্ষিক জলসায় হুযূর আনোয়ার (আই.) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে সূরা নিসার ২০ নম্বর আয়াত পাঠ করেনএবং অনুবাদ করার পর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মহিলাদের সাথে সদাচরণ কর; যাদেরকে তোমরা অন্য পরিবার থেকে বিয়ে করে এনেছ। তাদের আত্মিয়স্বজন, মা-বাবা এবং ভাইবোন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছ। তাদেরকে অযথা নির্যাতন করো না, তাদের অধিকার প্রদান কর এবং তাদের প্রাপ্য না দেওয়ার অজুহাত খুঁজো না। অপবাদ আরোপের সুযোগ সন্ধান করো না। এই অপচেষ্টায় লেগে থেকো যে, স্ত্রীর সম্পদ থাকলে কীভাবে তা থেকে সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধাও কয়েকভাবে ভোগ করা যায়। একটি হল বাহ্যিক ধন-সম্পদ, যাদৃশ্যমান। কোন কোন পুরুষ স্ত্রীকে এতটাই জ্বালাতন বা নির্যাতন করে যে, এর ফলশ্রুতিতে কোন কোন সময় স্ত্রী এমন কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় যার ফলে তার কোন চেতনাই থাকে না আর এই সুযোগে স্ত্রীর সম্পদ থেকে স্বামী সুবিধা ভোগ করতেথাকে। আবার কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না; তখন স্বামী এই চেষ্টায় থাকে যে, স্ত্রী যেন 'খুলা' নিয়ে নেয় আর স্বামীকে যেন তালাকও দিতে না হয় এবং 'মোহরানা'ও পরিশোধ করতে না হয়। এটাও আর্থিক সুবিধা ভোগের একটি পন্থা। এরপর অসহায় বিবাহিত নারীদের ওপর দীর্ঘদিন যাবৎ নির্যাতন চালাতে থাকে, অথচ মোহরানা স্ত্রীর অধিকার। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন আচরণ কোনভাবেই বৈধ নয়। আবার কখনো কখনো জোরপূর্বক বা প্রতারণামূলকভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি কুক্ষিগতকরে। যেমন, স্ত্রীর অর্থ দ্বারা বাড়ি ক্রয় করে এবং কোনভাবে স্ত্রীকে মানিয়ে নেয় যে, এটি আমার নামে দিয়ে দাও বা এর কিছুঅংশ আমার নামে লিখে দাও। এভাবে অর্ধেকাংশের মালিক বনে বসে আর মালিকানা স্বত্ত্ব লাভের পর আবার নির্যাতন করা আরম্ভ করে দেয়। আবার এটিও হয় যে,কখনো কখনো পৃথক হয়ে বা তালাক দিয়ে বাড়ির অংশ নিয়ে নেয়। অথবা কেউ কেউ ঘরে বসে থাকে আর স্ত্রীর উপার্জনে চলে। তিনি বলেন, এমন সব পুরুষই অবৈধ কাজ করছে। কখনো কখনো এমনও হয় যে, স্বামী মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন বা শ্বশুর বাড়ির লোকেরা সম্পত্তি দখল করে নেয় এবং অসহায় স্ত্রী কোন কিছুই পায় না আর তাকে ধাক্কা দিয়ে মা-বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মোটকথা এগুলো সবই জঘন্য অন্যায় কাজ, অবৈধ কাজ। ইসলাম আমাদেরকে বলছে যে, স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করো না। এখন বলুন, এত গভীরে গিয়ে নারীর অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়ার বিষয়টি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম থেকে প্রমাণিত হয় কি? ইসলামই সেই ধর্ম যা নারীর অধিকার প্রদান করিয়েছে।"

(যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, ৩১ শে জুলাই, ২০০৪)

এ বিষয়ে হুযূর আনোয়ার বলেন,প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ নিজ পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক। তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থাকা তার কর্তব্য। পুরুষদেরকে 'কাওওয়াম' তথা অভিভাবক বানানো হয়েছে। সংসারের ব্যয়ভার বহন করা, সন্তানাদির শিক্ষাদীক্ষার প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল চাহিদা এবং ব্যয় নির্বাহ করা- এর সবই পুরুষের দায়িত্ব। কিন্তু আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এই জামা'তেও কিছুএমন লোক আছে যারা সংসারের খরচ মেটানো বা উপার্জন করা তো দূরের কথা উপরন্তু স্ত্রীর কাছে হাত পাতে আর বলে, আমাদের খরচ নির্বাহ কর; অথচ স্ত্রীর উপার্জনে তার কোন অধিকার নেই। স্ত্রী যদি কোন কোন ব্যয়ভার নির্বাহও করে থাকে তবে তা হলো পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুগ্রহ।"

(খুতবা জুমআ, ৫ই মার্চ, ২০০৪)

স্ত্রীর সম্পদ সম্পত্তির প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি

কতক পুরুষের লোভ করা সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর এক খুতবায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন,

"আমাকে অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে, কানাডায় বিয়ে-শাদির পর খুব স্বল্প সময়ের ভেতর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তিক্ততার ঘটনা ঘটছে অথবা এজন্যও বিয়ে ভেঙ্গে যায় যে, পাকিস্তান থেকে আগত কোন ছেলে বিদেশে আসার জন্য বিয়ে সম্মতি দেয় আর এখানে এসে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। এমন লোকদের সামান্য ভয়ও হয় না। এসব ছেলের কিছুটা হলেও খোদাকে ভয় করা উচিত। যাদের সাথে আপনাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ আপনাদের বিদেশে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনাদের শিক্ষাগত কোন যোগ্যতা ছিল না। কোন এজেন্ট বা দালালের মাধ্যমে এলে পনেরো বা বিশ লক্ষ টাকা খরচ হতো। বিনা খরচে এখানে এসে গেছেন কেননা, এখানে আগত অধিকাংশ ছেলে টিকিটের টাকাও মেয়েপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে থাকে; কিন্তু এখানে এসে এ ধরনের চতুরতা প্রদর্শন করে! এখানে এসে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজের পছন্দের কোন সম্বন্ধ খুঁজে নেয় বা কোন কোনএবং কেউ কেউ অন্যান্য বাজে কাজে জড়িয়ে যায়; অধিকন্তু এমন ছেলেদের পিতা-মাতারাও তাদের অপকর্মের অংশীদার হয়ে থাকে। তারা এখানে বসবাসকারীই হোন বা পাকিস্তানে বসবাসকারী পিতামাতাই হোন না কেন।

তিনি (আই.) আরো বলেন,

এ ছাড়া কোন কোন ছেলের চোখ স্ত্রীদের সম্পত্তির উপর থাকে। সন্তানসন্ততিও হয়ে যায়, কোথায় বাচ্চাদের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করবে! কিন্তু তা না করে আইনের সুযোগ নিয়ে স্ত্রীদের তালাক

দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। আর নির্বুদ্ধিতাবশত: স্ত্রী যদি সম্পত্তি দুজনের নামে করে দেয় তাহলে সম্পত্তির সুবিধা ভোগ করে এবং এরপর স্ত্রী সন্তানদের ছেড়ে চলে যায়।"

(জুমআর খুতবা, ২৪ই জুন, ২০০৫)

একই প্রসঙ্গে অপর এক স্থানে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"বিবাহিত পুরুষদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রয়েছে যারা পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিয়ে করে এসব দেশে আসে এবং এখানে এসে কাগজপত্র যখন পাকাপোক্ত হয়ে যায় তখন স্ত্রীদের সাথে না থাকার বা স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার বিভিন্ন অজুহাত সন্ধান করে দেয়, তার ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু করে। আল্লাহ্ তালা বলেন

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণপূর্ণ জীবনযাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করে থাক তাহলে হতে পারে তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ্ তাতে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। অতএব, বিয়ে যখন হয়ে গেছে, তাই ভদ্রতার দাবি হলো, একে অপরকে সহ্য করুন, ব্যবহার ভালো করুন, পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে তোমরা যদি একে অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার কর তাহলে বাহ্যিক অপছন্দ পছন্দে পরিবর্তিত হতে পারে এবং তোমরা এই সম্পর্কের মাধ্যমে অনেককল্যাণ ও মঙ্গলের ভাগীদার হতে পার। কেননা, তোমরা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখ না, আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল ও কল্যাণ রেখে দেবেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, একবার আমি এক ছেলে সম্পর্কে জানতে পারলাম, তার স্ত্রীর সাথে তার ব্যবহার ভালো নয় বরং খুবই দুর্ব্যবহার করে। তিনি বলেন, একদিন তার সাথে আমার পথিমধ্যে সাক্ষ্যাৎ হয়ে গেল, আমি তাকে এই আয়াতের আলোকে বুঝালাম। সে সেখান থেকে সোজা তার ঘরে গেল এবং তার স্ত্রীকে বলল, তুমি কি জান আমি তোমার সাথে শত্রুর মত আচরণ করেছি, কিন্তু আজ হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, এখন থেকে আমি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, এরপর থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে কল্যাণের পর কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং তার ঘরে সুদর্শন চার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং তারা সুখে-শান্তিতে জীবন কাটিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় যদি তাঁর নির্দেশ মেনে চল তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এসব কল্যাণ দান করেন।

অতএব, যেসব ছেলে পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে এখানে এসে কিছুদিন পর এই বলে নিজেদের স্ত্রীদের ছেড়ে দেয় যে, আমাদের পছন্দ হয় নি বা কোন কোন ছেলে পাকিস্তান থেকে পিতামাতার কথা অনুযায়ী মেয়ে নিয়ে আসে এবং পরে বলে দেয় যে, আমাদের পছন্দ হয় নি, পিতামাতার কথায় বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছিলাম, তাদের উচিত একটু আত্মবিশ্লেষণ করা। যেমনটি আমি বলেছি, যেসব ছেলের কারণে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তারা দুই ধরনের। প্রধানত এখানে বসবাসকারী ছেলেরা, যারা মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসে এবং ভাবে যে, কিছুদিন দেখি মন-মতের মিল হয় কি-না। কেননা এখানকার পরিবেশে এই চিন্তাধারাই সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, প্রথমে দেখি দু'জনের মতের মিল হয় কিনা। যদি মিল না হয় তাহলে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দাও। অধিকন্তু এসব লোক যথাসময়ে নিজেদের বিয়ের নিবন্ধনও করায় না পাছে মেয়ের আইনানুগ নিরাপত্তা লাভ হয়ে যায় আর যেন এখানে থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে। এসব ক্ষেত্রে পিতামাতারাও সমানভাবে দোষী। যাহোক, এরপর জামা'ত এমন মেয়েদের দেখাশোনার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের এহেন কর্ম এটিই প্রকাশ করে যে, এরা কোনভাবেই জামাতভুক্ত থাকার অধিকার রাখে না ।

দ্বিতীয় ধরনের ছেলে তারা, যারা বহির্বিশ্ব থেকে এসে এখানকার মেয়েদেরকে বিয়ে করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিয়ে নিবন্ধনের চেষ্টা করে এবং যখন বিয়ের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তাদের ভিসা প্রভৃতি সম্পন্ন হয়ে যায় তখন তাদের চোখেমেয়েদের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়তে থাকে আর এরপর পৃথক হয়ে নিজেদের পছন্দ অনুসারে আবার বিয়ে করে নেয়। অতএব এই দুই ধরনের লোকই তাকওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। আপনারা নিজেদের প্রাণের প্রতি অবিচার করবেন না, জামা'তকে দুর্নাম করার চেষ্টা করবেন না আর তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন, তাকওয়ার পথে চলুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন দুরাচারীদের স্মরণ রাখা উচিত,তাদের উপরও এক পরাক্রমশালী সত্তা রয়েছেন, যিনি অনেক ক্ষমতাবান।"

(খুতবা জুমআ, ১০ই নভেম্বর, ২০০৬)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বাণী

প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তি নিজ পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধায়ক। তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থাকা তার কর্তব্য। স্বামীদেরকে 'কাওয়াম' তথা অভিভাবক বানানো হয়েছে। সংসারের ব্যয়ভার বহন করা, সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল চাহিদা এবং ব্যয়ভার ইত্যাদি নির্বাহ করা পুরুষের দায়িত্ব।"

(খুতবা জুমআ, ৫ই মার্চ, ২০০৪)

মোহরানার গুরুত্ব: প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং মোহরানা আদায়

হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরে এক জুমআর খুতবায় বলেন,

"দৈনন্দিন সাধারণ বিষয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়ে থাকে আর গড়াতে গড়াতে কোন কোন সময় তা ভয়াবহ ঝগড়া-বিবাদে পর্যবসিত হয়। কলহ-বিবাদের পর যদি মীমাংসার কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন উভয়পক্ষের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয় আরযখন মীমাংসাকারী প্রতিষ্ঠান উভয়পক্ষের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেন তখন সেখানে মীমাংসা হয়ে যায়। উভয়পক্ষ অঙ্গীকার করে যে, সবকিছুঠিক থাকবে, কখনো কখনো লিখিত চুক্তিও হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন সময় এমনও হয় যে, সমঝোতা করে অফিস বা আদালত থেকে বাইরে বের হতেই আবার মাথা ফাটা-ফাটি শুরু হয়ে যায়, অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য বা সম্মানই থাকে না। বিয়ে ও দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদীর ক্ষেত্রেও অঙ্গীকার রক্ষা করে না।

পারস্পরিক এই অঙ্গীকার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তাকওয়ার শর্তসমূহে প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তে জনসমক্ষে করা হয় কিন্তু কিছুএমন স্বভাবের লোকও আছে যারা এরও পরোয়া করে না। স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার দেয় না আর, তাদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করতে থাকে। স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সংসার-খরচ মেটাতে কৃপনতা করে। স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করে না। অথচ বিয়ের সময় অত্যন্ত গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে সবার সামনে ঘোষণা দেয় যে, হ্যাঁ! আমি এই মোহরানায় বিয়েতে সম্মত আছি।

এখন জানি না এমন লোকেরা দেখানোর জন্য মোহরানায় সম্মতি প্রকাশ করে নাকিপূর্ব হতেই মনে এই দুরভিসন্ধি থাকে যে, মোহরানা যা-ই নির্ধারণ করা হচ্ছে লিখিয়ে নাও, তা তো আর দিচ্ছি না। এধরনের লোকদের এই হাদীস দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, যারা এমন মনোবৃত্তি বা দুর্ভিসন্ধি নিয়ে মোহরানা ধার্য করে তারা ব্যভিচারী।

আল্লাহ্ কৃপা করুন, শতকরা একভাগের নীচেও যদি আমাদের মাঝে এমন লোক থেকে থাকে, হাজারে একজনও যদি এমন থেকে থাকে তাহলেও আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। কেননা, পুরনো আহমদীদের শিক্ষাদীক্ষার মান যদি উন্নত হয় তাহলে নতুন আহমদীদেরও সঠিক তরবিয়তের সম্ভাবনা থাকে। তাই এসব বিষয়ে গভীর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(খুতবা জুমআ, ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪)

অপর এক স্থানে হুযূর (আই.) মোহরানা আদায়ের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য মোহরানা ধার্য করে কিন্তু অভিসন্ধি থাকে যে পরিশোধ করবে না তাহলে সে ব্যভিচারী এবং যে ব্যক্তি পরিশোধ না করার মনমানসিকতা নিয়ে ঋণ করে আমি তাকে চোর গণ্য করি।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩১)

"এখন চিন্তা করে দেখুন, মোহরানা পরিশোধ করা একজন পুরুষের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নিয়্যতেই যদি ত্রুটি থাকে তাহলে এটি খিয়ানত বা চুরি।"

(খুতবা জুমআ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪)

হুযুর আনোয়ার মোহরানা আদায় করা প্রসঙ্গে আরো বলেন,

"কখনো কখনো অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে বা দ্বিতীয় বিয়ের আকাঙ্খায়, যা কারো কারো মনে সৃষ্টি হয়, আনায়াসে প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। কারো যদি বিয়ে করার ইচ্ছা থাকে আর বৈধ প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে বিয়ে করবে কিন্তু অসহায় প্রথম স্ত্রীকে দুর্নাম করা উচিত নয়। যদি স্ত্রীকে এড়ানোর জন্য (এমনটি) করে থাকে অর্থাৎ (মনে মনে ভাবে) আমি যদি এ ধরণের কথা বলি তাহলে সে নিজে থেকেই 'খুলা' নিয়ে চলে যাবে (অর্থাৎ মোহরানা যদি পরিশোধ না করে থাকে) আর আমি মোহরানা না দিয়েই পার পেয়ে যাবো! এটিও খুবই হীন বা জঘন্য কাজ। প্রথমত এমন পরিস্থিতিতে খোলা হলে কাযা (বা বিচার বিভাগের) অধিকার রয়েছে মোহরানা পরিশোধের সিদ্ধান্ত দেওয়ার। দ্বিতীয়ত: এখানকার আইনানুযায়ীও কোন কোন খরচ বহন করার বিধান রয়েছে।"

(খুতবা জুমআ, ১০ই নভেম্বর, ২০০৬)

মোহরানা-সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর অধিকার

হুযূর আনোয়ার (আই.) ২০১১ সনে জলসা সালানা জার্মানিতে মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

আমরা তো আর মোহরানা নিচ্ছি না! আমরা মোহরানা ছেড়ে দিয়েছি! -এ ধরণের মনমানসিকতা নিয়ে কোন কোন ছেলের কাছ থেকে বড় অঙ্কের মোহরানা লেখানো হয়। যদি মোহরানা গ্রহণ না করা হয় তাও মিথ্যাচার। মোহরানা এজন্যই নির্ধারণ করা হয়, যেন স্ত্রী তা গ্রহণ করে এবং এটি নারীর অধিকার, এটি তার নেওয়া উচিত।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী বললেন, আমার স্ত্রী মোহরানা ফেরত দিয়ে দিয়েছে, ক্ষমা করে দিয়েছে। তিনি (আ.) বললেন, তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীর হাতে মোহরানার অর্থ দাও, এরপর যদি সে তা ফিরিয়ে দেয় তাহলে মোহরানা মাফ হবে নইলে নয়। বেচারার দুই স্ত্রী ছিল। যাহোক তিনি ঋণ নিয়ে যখন উভয় স্ত্রীর হাতে সমপরিমাণ মোহরানার অর্থ তুলে দেন এবং বললেন যে, এখন ফেরত দাও তোমরা তো পূর্বেই মাফ করে দিয়েছ। তখন তারা বলল, আমরা তো এজন্য মাফ করে দিয়েছিলাম যে, আমাদের ধারণা ছিল, তোমার দেয়ার মত ক্ষমতা নেই আর তুমি কখনো দিবেও না। এখন যেহেতু দিয়ে দিয়েছ তাই এখন যাও। অতঃপর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসলেন, শুনে তিনি অনেক হাসলেন এবং বললেন, ঠিক হয়েছে, এমনই হওয়া উচিত ছিল।"

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে জুলাই, ১৯২৫,খুতবাতে মাহমুদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২১৭)

মোহরানার গুরুত্ব সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"অতএব, 'মোহরানা নির্ধারণ' গ্রহণ করার জন্যই হয়ে থাকে মাফ করে দেওয়ার

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

জন্য নয়, এটি গ্রহণ করাটাই নারীর অধিকার। যারা মাফ করতেই চান তারা প্রথমে বলুন যে, মোহরানার টাকা আমাদের হাতে দাও আর এরপর যদি মন এত বড় হয়, এতই যদি উদার হয়ে থাকেন, তাহলে ফেরত দিয়ে দিন।

যাহোক, মোহরানার পরিমাণ যদি বেশি ধার্য করা হয় আর এরপর যখন 'খুলা' বা তালাকের সিদ্ধান্ত হয় তখন কাজা বা বিচার বিভাগের মোহরানা পুনঃনির্ধারণ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, অর্থাৎ যদি কারো সামর্থ্য না থাকে আর অন্যায়ভাবে মোহরানা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাহলে; আর এমন ঘটনা ঘটে থাকে। অনেকে এমনও আছে যারা আদালতের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধী করে নেয় আর ছেলে-মেয়ে উভয়ই এতে জড়িত আর পরবর্তীতে তারা বলে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এই অধিকার ছিল; এরপর তারা আবার জামা'তেরও শরণাপন্ন হন। যদি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেই অধিকার থেকে থাকে তাহলে আইনী অধিকার নেওয়ার পরিবর্তে শরিয়ত সম্মত অধিকার নাও। কখনো কখনো প্রাপ্য অধিকার দেশীয় আইনে শরীয়তসম্মত অধিকারের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে তাই অধিকার যেকোন এক দিক থেকেই গ্রহণ করা উচিত। অন্যায় করা উচিত নয়। কোন এক পক্ষের ওপর অবিচার করা উচিত নয়। ছেলের ওপরও নয় আর মেয়ের ওপরও নয়। পরিতাপ! এজন্য মিথ্যারও আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো এমন অপছন্দনীয় কাজ যা দেখে একজন ভদ্র ও সভ্য মানুষ এটিকে ঘৃণা না করে পারে না।"

(জলসা সালানা জার্মানী, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, ২৫ শে জুন, ২০১১)

তালাকের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ঝগড়া-বিবাদের পরিস্থিতিতে মোহরানা পরিশোধ করা সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

" কোন কোন দাম্পত্য কলহ এমনও সামনেআসে, যেক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, আমি তোমাকে ছাড়বোও না, তালাকও দিবো না আর তোমার সাথে সংসারও করবো না। কাযা বা বিচারিক আদালতে যদি এমন মোকদ্দমা থাকে তাহলে অযথাই মোকদ্দমাকে প্রলম্বিত করা হয়, অজুহাত ও বাহানা খোঁজা হয় যার ফলে মামলা দিনের পর দিন ঝুলে থাকে। আমি এর আগেও অনেকবার একথা বলেছি, অনেককে এ কারণে তালাক দেওয়া হয় না, যাতে স্ত্রী নিজ থেকেই 'খোলা' নিয়ে নেয় আর যাতে মোহরানা আদায় করা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় অর্থাৎ মোহরানা আদায় করতে না হয়। সুতরাং এসব এমনই বিষয়, যা মানুষকে তাকওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিজেদের সংশোধন কর, তোমরা যদি নিজেদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার করুণা ও ক্ষমার আকাঙ্খী হয়ে থাক তাহলে নিজেরাও করুণাপ্রদর্শন কর এবং স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে ঘরেই সুখ শান্তি তো রাখ। আল্লাহ্ তা'লার ব্যাপক করুণা থেকে যদি অংশ লাভ করতে চাও তাহলে নিজের দয়ামায়াকেও বিস্তৃত কর।"

তিনি (আই.) আরো বলেন,

"আমি এখনই তালাকের কথা বলছিলাম যে, অনেক পুরুষ তালাকের মামলাকে ঝুলিয়ে রাখে এবং দীর্ঘসূত্রিতার মাঝে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথম কথা হলো, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে, আর কখনো কখনো সন্তানাদিও হয়ে যায় এরপর তালাকের পালা এসে যায়। স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার কী তা স্পষ্ট আর তা প্রদান করা পুরুষের আবশ্যিক কর্তব্য। এছাড়া সন্তানদের খরচাদি এবং মোহরানা ইত্যাদিও রয়েছে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয় যে মেয়ে স্বামীর বাড়ী যায় নি বা মোহরানাও নির্ধারিত হয় নি; সেক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নারীর অধিকার আদায় কর। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ তোমাদের কোন পাপ হবে না যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও অথবা এমন অবস্থায় যখন তাদের জন্য দেনমোহর ধার্য কর নি। আর তোমরা তাদের কিছুটা উপকার সাধন কর, বিত্তবানের ওপরও তার সামর্থ অনুযায়ী আবশ্যক এবং বিত্তহীনের ওপর তার সাধ্যানুযায়ী অর্থাৎ ন্যায়সংগতভাবে তাদের উপকার সাধন করা আবশ্যিক। সৎকর্মশীলদের জন্য এটি অবশ্য কর্তব্য। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, স্বামীর পক্ষ থেকে যদি সম্বন্ধ না রাখার প্রশ্ন উঠে, এর কারণ যা-ই হোক না কেন, পুরুষের কর্তব্য, এই বিবাহ বন্ধনের ইতি টানার সময় স্ত্রীর প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করা এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্ তা'লা যদি স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে থাকেন তাহলে পুরুষের প্রতি নির্দেশ হলো, সেই ঐশ্বর্য্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাও। যদি ঐশ্যর্যের বহিঃপ্রকাশ না কর তাহলে যে আল্লাহ্ তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন তিনি তা প্রত্যাহার করারও ক্ষমতা রাখেন। তিনি স্বচ্ছলতা দান করেছেন, যদি প্রাপ্য অধিকার আদায় না কর, সুন্দর ব্যবহার না কর তাহলে তিনি স্বচ্ছলতাকে অস্বচ্ছলতায় পরিবর্তনের ক্ষমতাও রাখেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন যদি হতে চাও তাহলে স্ত্রীর সাথে সদয় আচরণ করে নিজের স্বচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশ কর। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতি তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে বোঝা অর্পন করেন না তাই তিনি বলেছেন, দরিদ্র যদি বেশি দেওয়ার সামর্থ্য না রাখে তাহলে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকুপ্রাপ্য প্রদান করতে পারে- করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ন ও তাকওয়াশীল হয়ে থাক তাহলে এই অনুগ্রহ করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

মহানবী (সা.) এ বিষয়ে কতটা কড়াকড়ি আরোপ করেছেন তা স্পষ্ট হয় একটি হাদীস হতে। একবার এক আনসারী বিয়ে করেন

এবং এরপর সেই নারীকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেন এবং তার দেন-মোহরও ধার্য করা হয় নি। এই বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উত্থাপিত হলে তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে অনুগ্রহ করে কিছুদিয়েছ? উত্তরে সেই সাহাবী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে তো তাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই। তখন তিনি (সা.) বললেন, তোমার কাছে যদি দেওয়ার মত কিছুই না থাকে তাহলে তোমার মাথায় পরিহিত টুপিটিই তাকে দিয়ে দাও।

(রূহুল মাআনী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৮৫-৭৮৬, তফসীর সূরা বাকারা, আয়াত নম্বর ২৩৭ দ্রষ্টব্য)

এ থেকে স্পষ্ট হয়, মহানবী (সা.) নারীর অধিকারের বিষয়ে কত জোর দিয়েছেন অধিকারের বিষয়ে কত জোর দিয়েছেন আর কতবেশী যত্নবান ছিলেন! এ ঘটনায় (তিনি বলেন) দেন-মোহর ধার্য না হলেও কিছুনা কিছুঅবশ্যই দাও। কিন্তু যদি দেন-মোহর পূর্বেই ধার্য করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? পরবর্তী আয়াতে

এ বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে অর্থাৎ যখন দেন-মোহর ধার্য করা হয়ে গিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এর অর্ধেকাংশ পরিশোধ কর।"

(খুতবা জুমআ, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৯)

সম্পর্ক বন্ধনে তিক্ততা সৃষ্টির কতিপয় কারণ:

অপছন্দের বা অসম্মতির বিয়েবাধ্য হয়ে যেসব বিয়ে করা হয়, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এর কোন কোনটির ক্ষেত্রে তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গ হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"অনেক মেয়ে পিতামাতার কথায় বিয়ে করে ফেলে। প্রথমে সত্য বা ন্যায়সঙ্গত কথা বলার সাহস পায় না। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এমন কিছুআচরণ সামনে আসে যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আস্থা কমে যায় আর ঝগড়াবিবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কখনো কখনো বিয়ে করে পাকিস্তান থেকে চলে আসে, জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে খোঁজখবর নেয়া হয় না বা রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয় না; পরে আবার বলা হয় যে, জামা'ত আমাদের সাথে কোন সহযোগিতা করে নি। এখানে বসবাসকারী কিছুছেলে বিয়ে করে মেয়েদেরকে আনিয়ে নেয় এবং তাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন করে আর এরপর সম্পর্ক বিচ্ছেদ বা তালাকে গড়ায়। সুতরাংজামা'তের চিন্তা করা উচিত।

মেয়েরা অনেক সময় বিয়ের পর বলে বসে, আমার এই সম্বন্ধ পছন্দ নয়। পিতামাতাবলেছিলেন তাই বাধ্য হয়েছিলাম। কোন কোন ছেলেও বিয়ের পর এমন কথা বলে। ছেলেদের মধ্যেও এতটুকুসৎসাহস নেই। অনেক সময় পরে জানা যায় যে, ছেলে বা মেয়ে অন্য কারো সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল বা অন্য কোন সম্বন্ধ পছন্দ করে। প্রথমেই যদি এরা নিজেদের পছন্দের কথা জানিয়ে দেয় তাহলে এভাবে দুটি পরিবারের শান্তি বিপন্ন হতো না। অধিকন্তু এমন ঘটনাও রয়েছে যেখানে পিতামাতা পূর্ব থেকেই পরিস্থিতি অবগত থাকেন, কিন্তু তবুও বিয়ে করিয়ে দেন এ ধারণায় যে বিয়ের পরে সব ঠিক হয়ে যাবে- অথচ এমনটি হয় না। ছেলে হোক বা মেয়ে, তারা শুধরায় না, কিন্তু দু'জনের মাঝে একজনের জীবন তো অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়।"

(জলসা সালানা জার্মানী, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, ২৫ শে জুন, ২০১১)

এই একই প্রসঙ্গে অপর এক উপলক্ষ্যে হুযুরর আনোয়ার (আই.) বলেন,

" উপরন্তু কিছুমেয়ে এমন জায়গায় বিয়ে করতে চায় যেখানে পিতামাতার মত থাকে না; যেমন, ছেলে আহমদী নয় বা ধর্মের সাথে ছেলের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মেয়ে গোঁ ধরে বসে যে, আমি সেখানেই বিয়ে করবো। অপরদিকে ছেলেদের বেলায়, কোন কোন ছেলে এমন কিছু আচরণে বা কর্মে লিপ্ত হয়ে যায় যা গোটা পরিবারকে দুর্নামের কারণ হয়। অতএব, এজন্যই এই দোয়া শিখানো হয়েছে যে, হে আল্লাহ্ আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে কোন ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন করো না বরং তাদের মাঝে আমাদের জন্য কল্যাণ রেখে দাও। আর এই দোয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই এমনকি সন্তান গর্ভে আসার প্রাথমিক অবস্থা থেকেই করা উচিত।"

(খুতবা জুমআ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর এক ভাষণে আহমদী নারীদের মর্মস্পর্শী নসীহত করে বলেন,

"ধর্ম সম্পর্কে সর্বদা একজন আহমদী মেয়ের এই চেতনাবোধ থাকা উচিত যে, আমি আহমদী এবং আমি যদি জামা'তের বাইরে কোথাও বিয়ে করি তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিতে পারে এবং আমার বিশ্বাসেও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে কেননা অন্য ঘরে গিয়ে, ভিনধর্মীর ঘরে গিয়ে, তাদের প্রভাবে আমিও প্রভাবিত হতে পারি।"

(জলসা সালানা যুক্তরাজ্য, মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ২৮ শে জুলাই, ২০০৭)

অপর এক উপলক্ষ্যে হুযুর (আই.) বলেন,

"এরপর এমন মামলাও এখন সামনে আসছে যাতে দেখা যায়, বিয়ে হতে না হতেই ঘৃণা-বিদ্বেষও দেখা দেয় এমনকি বিয়ের সময়ই ঘৃণার সৃষ্টি হয়ে যায়। বিয়ে তাহলে করলে কেন? দুর্ভাগ্যবশত এখানে অর্থাৎ এসব দেশে এমন ঘটনার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। হয়তোবা আহমদীরাও অন্যদের রঙ ধারণ করছে। অথচ আহমদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পূর্ণভাবে নিজ ধর্মের রঙে রঙীন করার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। অতএব, যদি পছন্দসই বিয়ে নাও হয়ে থাকে তবুও উচিত ছিল একসাথে বসবাস করা, একে অপরকে বুঝা এবং সেই উপদেশে অভিনিবেশ করা যার ভিত্তিতে তোমরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ অর্থাৎ তাকওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল। সব কিছুকরার পরও যদি তোমাদের মধ্যকার ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ কর আর এর জন্যও প্রথমে নির্দেশ হলো, দু'জন মীমাংসাকারী নির্ধারণ কর, আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে বস, চিন্তা কর এবং গভীরভাবে ভেবে দেখ; উভয় পক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। পরিতাপের বিষয় হলো, বিরল ঘটনা হলেও কোন কোন মেয়ের পক্ষ থেকে প্রথম দিনই এই দাবি উত্থাপিত হয় যে, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু এর সাথে থাকবো না। খতিয়ে দেখলে জানা যায় যে, ছেলে বা মেয়ে পিতামাতার চাপের মুখে বিয়ে করে নিয়েছিল কিন্তু আসলে তাদের অন্য কোথাও বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং পিতামাতারও ভাবা উচিত এবং দু'টি জীবনকে এভাবে নষ্ট করা উচিত নয়।"

(খুতবা জুমআ, ১০ই নভেম্বর, ২০০৬)

(মূল: 'আয়েলী মাসায়েল অউর উনকা হাল)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 24 Aug, 2023 Issue No.34

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২ পাতার পর....

প্রমাণ হয় যে, বিয়ের সময় হযরত আয়েশা (রা.)'র একটি যুক্তিযুক্ত বয়স ছিল, যে বয়সে সাধারণত কুরাইশরা তাদের মেয়েদের বিয়েশাদী দিতো। ঐ যুগে আরব সমাজে এই বিয়ে কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল না আর এতে আপত্তি করার মতোও কোনো অবস্থা ছিল না যে, মুনাফিক ও কাফিররা এই (বিয়ে) নিয়ে আপত্তি করতো কিংবা তিরষ্কার অথবা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক আপত্তি করতে পারত।

প্রশ্ন: একইভাবে আরেকটি সমস্যা অর্থাৎ, 'কোনো অপারগতা হেতু ইমাম যদি বসে নামায পড়ায় তাহলে মুক্তাদীদের কীভাবে নামায পড়া উচিত?'

এ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, উত্তর: বিভিন্ন হাদীস থেকে এ সম্পর্কে অত্যন্ত বিশদভাবে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানা যায়। যেমন, হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বুখারী শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) তাঁর প্রথম জীবনে একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বসে নামায পড়াতেন আর সাহাবীরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে আরম্ভ করেন, তখন তিনি (সা.) তাদেরকে ইশারায় বসে যেতে বলেন এবং নামাযের পর তাদেরকে বলেন, ইমাম এজন্য মনোনীত করা হয় যাতে তাঁর অনুসরণ করা হয়, কাজেই যেভাবে তিনি নামায পড়েন তোমরাও সেভাবেই নামায পড়।

কিন্তু মহানবী (সা.)-এর অন্তিম রোগ, যাতে তিনি ইন্তেকাল করেন; তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামাযের ইমামতি করানোর জন্য নির্দেশ দেন, কিন্তু এরপর যখন হুযূর (সা.) কিছুটা সুস্থবোধ করেন তখন তিনি নামাযের জন্য যান এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র বাদিকে বসে নামায পড়েন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সে সময় হযরত আবু বকর (সা.) সেই নামাযে মহানবী (সা.)-এর একতেদা বা অনুসরণ করছিলেন আর অন্য মানুষরা হযরত আবু বকর (রা.)'র একতেদা বা অনুসরণ করছিল।

আসলে (উপস্থিত) মানুষজনও মহানবী (সা.)-এর-ই 'একতেদা' বা অনুসরণ করছিলেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে মহানবী (সা.) যেহেতু উচ্চস্বরে তকবীর ইত্যাদি বলতে পারছিলেন না তাই হযরত আবু বকর (রা.) মুকাব্বির হিসেবে মহানবী (সা.)-এর আওয়াজ পেছনের লোকদের কাছে পৌঁছাচ্ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আবু বকর (রা.)'র বা পাশে মহানবী (সা.)-এর উপবিষ্ট হওয়া বলছে যে, হুযূর (সা.)ই সেই নামাযের ইমাম ছিলেন, কেননা ইমাম বা'দিকে দাঁড়ান আর মুক্তাদী ডান দিকে। কাজেই, এ সম্পর্কেও আমরা হুযূর (সা.)-এর সুন্নত দেখতে পাই যে, একদা হুযূর (সা.) যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন, এরপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পরবর্তীতে নামাযে যোগ দিয়ে মহানবী (সা.)-এর বা'দিকে দাঁড়ান তখন মহানবী (সা.) তার মাথা ধরে তাকে নিজের ডান দিকে নিয়ে দাঁড় করান।

হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) এ সম্পর্কে তার গুরু হামীদী'র একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর প্রথম নির্দেশ এটিই ছিল যে, যদি ইমাম বসে নামায পড়েন তাহলে মুক্তাদীরাও বসেই নামায পড়বে। কিন্তু পরবর্তীতে হুযূর (সা.) বসে নামায পড়েছেন কিন্তু পেছনে সাহাবীরা দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে বসার নির্দেশ দেন নি। এছাড়া যেহেতু হুযূর (সা.)-এর সর্বশেষ কাজকে সনদ হিসেবে গ্রহণ করা হয় আর (এ বিষয়ে) তাঁর সর্বশেষ আমল বা আদর্শ এটিই ছিল যে, ইমাম যদি তার কোনো অপারগতার কারণে বসেও নামায পড়ে তাহলে মুক্তাদী দাঁড়িয়েই নামায পড়বে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, "আমার যেহেতু বাতের ব্যথার সমস্যা আছে তাই আমি দাঁড়িয়ে জুমুআর খুতবা দিতে পারি না। একইভাবে নামাযও দাঁড়িয়ে পড়তে পারি না। শুরুতে মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ ছিল যে, ইমাম যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারে তাহলে মুক্তাদীরাও বসে নামায পড়বে কিন্তু পরবর্তীতে খোদা তা'লার নির্দেশের অধীনে তিনি (সা.) এই নির্দেশ পরিবর্তন করেন এবং বলেন, ইমাম যদি কোনো অপারগতায় বসে নামায পড়ান তাহলে মুক্তাদীরা যেন না বসেন বরং তারা দাঁড়িয়েই নামায পড়বে। কাজেই আমি যেহেতু দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে পারি না তাই আমি বসে নামায পড়াবো কিন্তু বন্ধুরা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন।"

(দৈনিক আল্ ফযল, লাহোর, ৩ জুলাই ১৯৫১, পৃ: ৩)

অতএব, ইমাম যদি তার কোনো অপারগতার কারণে বসে নামায পড়েন সেক্ষেত্রে মুক্তাদীরা দাঁড়িয়েই নামায পড়বে।

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জনৈক বন্ধু লিখেছেন যে, হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (রা.) তাঁর সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে মহিলাদেরকে পুরুষদের মতো বাজামা'ত নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসা আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন। হুযূরও এ বিষয়ে মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২৬শে নভেম্বর, ২০১৮ সালের পত্রে নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (রা.) তাঁর এই ভাষ্যগ্রন্থে সূরা আহযাবের ওয়া আকিমনাস্ সালাতা আয়াতের বরাতে মহিলাদের জন্য মসজিদে এসে বাজামা'ত নামায পড়ার যে দলীল প্রদান করেছেন তা তার রুচিশীল ব্যাখ্যা, যা ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের আমল বা অনুশীলন, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং আহমদী খলীফাগণের বিভিন্ন ব্যাখ্যার পরিপন্থী হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয় বা সঠিক নয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নামায প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যাতে মসজিদে উপস্থিত হয়ে বাজামা'ত নামায পড়াও অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এই ব্যাখ্যা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ হল, নিজেদের বাড়িতে নির্ধারিত সময়ে সকল শর্ত মেনে পাঁচবেলার নামায পড়া। কিন্তু কোনো মহিলা যদি মসজিদে গিয়ে এসব নামায পড়তে চায় তাহলে ইসলাম এক্ষেত্রে বারণও করেনি। যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে মহিলারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। কিন্তু মহানবী (সা.) মহিলাদের জন্য এটিই অধিক পছন্দ করতেন যে, তারা যেন নিজেদের বাড়িতে সেসব নামায পড়েন। অতএব, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন:-

"মহিলাদের নামায তাদের বাড়ির চেয়ে তাদের কক্ষে উত্তম এবং নিজেদের কক্ষের চেয়ে নিজেদের কুঠুরির নামায তাদের জন্য উত্তম।"

(সূনান আবু দাউদ)

অনুরূপভাবে আরেকটি রেওয়ায়েতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)'র নির্দেশ হল,

" মহানবী (সা.)-এর সামনে এমন কোনো পরিস্থিতি দেখা দিলে, (যা মহিলারা এখন নতুন সৃষ্টি করেছে) তাহলে তিনি (সা.) তাদেরকে অবশ্যই মসজিদে আসতে বাধা দিতেন, যেমনটি বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছিল। (সহীহ্ বুখারী)

অতএব বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, মহিলাদের জন্য বাড়িতে নামায পড়া অধিক উত্তম ও শ্রেয়। বরং এটিও আছে যে, বাড়িতেও আঙ্গিনা কিংবা উন্মুক্ত জায়গা, যেখানে সচরাচর মানুষের যাতায়াত হয়, সেখানেও যেন তারা নামায না পড়ে। আঙ্গিনায় নামায পড়ার চেয়ে তাদের জন্য নিজের হুজরা বা কক্ষে নামায পড়া উত্তম। এই নির্দেশ সত্ত্বেও তাকে কেন বলা হবে যে, মসজিদে গিয়ে নামায পড়। তাই মহিলাদের জন্য বাড়িতে নামায পড়া অবশ্যই উত্তম আর তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া আবশ্যক নয়।

সেই (প্রাথমিক) যুগে যেহেতু মহিলারা পুরুষদের পেছনের (কাতারে দাঁড়িয়ে) নামায পড়ত। পুরুষরা সামনে দাঁড়াতো (আর মহিলারা পেছনে)। সেসময় মহিলাদের জন্য বর্তমান যুগের মতো রীতিমতো কোনো Enclosureবা পৃথক জায়গা থাকতো না তাই হতে পারে পুরুষরা আসা-যাওয়ার সময় মহিলাদের দেখে ফেলবে, এ কারণেও তাদেরকে বাড়িতে নামায পড়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এমন পরিস্থিতির কারণে সেযুগের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন হাদীস ছিল কিন্তু বর্তমানেও মহিলাদের জন্য এটিই উত্তম, তারা মসজিদে যাওয়ার পরিবর্তে যেন নিজেদের বাড়িতেই নামায পড়েন। কেননা, পূর্বে বর্ণিত দুটি হাদীস স্পষ্টভাবে এর সমর্থন করে যে, মহিলারা বাড়িতে নামায পড়বে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir